জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকীতে বিশেষ কার্যক্রম হিসেবে প্রকাশিত

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

“গাভী পালন ও ব্যবস্থাপনায় উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার”

রেড চিটাগাং ক্যাটেল উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
সাভার, ঢাকা।

রেড চিটাগাং ক্যাটেল উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
সাভার, ঢাকা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকীতে বিশেষ কার্যক্রম হিসেবে প্রকাশিত

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

‘গাভী পালন ও ব্যবস্থাপনায় উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার’

রেড চিটাগাং ক্যাটেল উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
সাভার, ঢাকা।

গাভী পালন ও ব্যবস্থাপনায় উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার

প্রথম সংস্করণ	ঃ ১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) কপি
প্রকাশকাল	ঃ ডিসেম্বর, ২০২১
বিএলআরআই প্রকাশনা নং	ঃ ৩২৯
প্রকাশনায়	ঃ রেড চিটাগাং ক্যাটেল উন্নয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর অর্থায়নে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) সাভার, ঢাকা-১৩৪১
ফোন	ঃ +৮৮-০২-২২৪৪৯১৬৭০-৭২
ফ্যাক্স	ঃ +৮৮-০২-২২৪৪৯১৬৭৫
ইমেইল	ঃ dg@blri.gov.bd

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

কম্পিউটার ডিজাইন	ঃ আসিফ হাসান
মুদ্রনে	ঃ হাসান কালার প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
মূল্য	ঃ প্রথম সংস্করণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকীতে বিশেষ কার্যক্রম হিসেবে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
সাভার, ঢাকা ১৩৪১

মুখবন্ধ

ডেইরি শিল্প দেশের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় লাভজনক কৃষি ব্যবসাগুলোর মধ্যে অন্যতম। ডেইরি সেক্টর একটি উদীয়মান শিল্প হিসেবে এগিয়ে যাচ্ছে। যা গত কয়েক দশকে এককভাবে প্রাণিসম্পদ খাতে সম্ভাবনাময় কৃষি শিল্প প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে। অল্প প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে অধিক উৎপাদন ও নিরাপদ পুষ্টির চাহিদা মেটাতে দুগ্ধশিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনাময় খাত। বেকারত্ব দূরীকরণ ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য দুগ্ধশিল্প একটি অন্যতম ক্ষেত্রে পরিনত হয়েছে। সম্ভাবনাময় এই শিল্পের জন্য সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে এর পরিধিকে আরও বিস্তৃত করা সময়ের দাবি। উন্নত দুগ্ধ উৎপাদনকারী জাত, যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও রোগ নিরাময়সহ স্বল্প মূল্যে সুষম খাদ্যের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি, স্থিতিশীল বাজার ব্যবস্থাপনা, গবেষণা এবং দুগ্ধ শিল্পের প্রসার কার্যক্রমকে জোরদারকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশে চলমান শ্বেতবিপ্লব কার্যক্রমকে আরও বেগবান করা প্রয়োজন। সুস্থ ও মেধাবী জাতি গঠনে চলমান এই শ্বেতবিপ্লবকে আরও বিকশিত করে দেশের ডেইরি সেক্টরকে একটি অন্যতম সম্ভাবনাময় শিল্পে রূপদান করা সম্ভব। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দেশের ডেইরি উন্নয়নের লক্ষ্যে খামারীদের সমস্যা ভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনসহ খামারী ও উদ্যোক্তাদের প্রযুক্তিগত পরামর্শ প্রদান করে আসছে। এ সকল বিজ্ঞান ভিত্তিক বিষয়গুলো খামারীদের আরও যুগোপযোগী ও সহজেই বোধগম্য করার লক্ষ্যে স্বাধীনতার এই সুবর্ণ জয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকীতে বিশেষ কার্যক্রম হিসেবে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট **"গাভী পালন ও ব্যবস্থাপনায় উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার"** শিরোনামে একটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রকাশ করতে যাচ্ছে, যা দেশের প্রান্তিক থেকে সকল পর্যায়ের খামারীদের উপকারে আসবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি মনে করি, উন্নত প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনায় গাভী পালন করলে দুধের উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পাবে সেই সাথে ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারীগণও গাভী পালনে উৎসাহিত হবে।

ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন

উপদেষ্টা ঃ

ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)

সম্পাদনায় ঃ

ড. নাসরিন সুলতানা
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও পরিচালক গবেষণা (রু.দা.)

ড. সরদার মোহাম্মদ আমানুল্লাহ
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রাণী উৎপাদন গবেষণা বিভাগ ও
বিভাগীয় প্রধান প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি পরীক্ষণ বিভাগ।

লেখকবৃন্দ ঃ

ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)

ড. নাসরিন সুলতানা
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও পরিচালক গবেষণা (রু.দা.)

ড. বিপ্লব কুমার রায়
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রাণী উৎপাদন গবেষণা বিভাগ

ড. মোছাঃ পারভীন মোস্তারী
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রাণী উৎপাদন গবেষণা বিভাগ

ড. গৌতম কুমার দেব
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বায়োটেকনোলজি গবেষণা বিভাগ

ড. সরদার মোহাম্মদ আমানুল্লাহ
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রাণী উৎপাদন গবেষণা বিভাগ ও
বিভাগীয় প্রধান প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি পরীক্ষণ বিভাগ।

ড. মুহাম্মদ আবদুস সামাদ
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রাণিস্বাস্থ্য গবেষণা বিভাগ

নাজমুল হুদা
ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রাণী উৎপাদন গবেষণা বিভাগ

মোঃ আহসানুল কবির
ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বায়োটেকনোলজি গবেষণা বিভাগ

যোবায়দা শোভনা খানম
ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, প্রাণী উৎপাদন গবেষণা বিভাগ

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
০১	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের উন্নয়নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান	১-২
০২	বাংলাদেশে দুগ্ধ উৎপাদনকারী গরুর জাতসমূহ দুধাল গাভী চেনার উপায় এবং একটি দুধাল গাভী মূল্যায়ণের বিবেচ্য বিষয় সমূহ	৩-৯
০৩	দুগ্ধ উৎপাদনকারী গাভীর জন্য বাসস্থান নির্মাণের বিবেচ্য বিষয়সমূহ এবং নির্মাণ কৌশল	১০-১২
০৪	গাভী ও বাছুরের বিভিন্ন ধরণের রোগসমূহ (ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসজনিত) ও উহার প্রতিকার	১৩-১৯
০৫	দুধাল গাভীর মেটাবলিক (বিপাকীয়) রোগসমূহ ও প্রতিকার	২০-২৬
০৬	দুগ্ধ উৎপাদনকারী গরুর খামার পরিকল্পনা (১০/১০০টি গাভী)	২৭-৩১
০৭	দুধের মিনি পাস্তুরিকরণ ও সংরক্ষণ প্রযুক্তি; দুগ্ধপণ্য উৎপাদনে দেশী প্রযুক্তি (দই এবং পনির)	৩২-৪১
০৮	উন্নত জাতের ঘাস পরিচিতি, চাষ পদ্ধতি (নেপিয়ার, পারা, ভূট্টা) উন্নত জাতের ঘাস প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ এবং ৫ টি গরুর জন্য সাইলেজের পরিমাণ নির্ণয়	৪২-৫৫
০৯	দুধ উৎপাদনে গাভীর খাদ্যে রাসায়নিক দ্রব্য, এন্টিবায়োটিক ও হরমোন ব্যবহারে প্রাণী ও জনস্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব	৫৬-৫৯
১০	দুগ্ধ উৎপাদনকারী গাভীর খাদ্য উপাদানসমূহ ও সুষম খাদ্য প্রস্তুতকরণ	৬০-৬৮
১১	দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম প্রজননের গুরুত্ব, প্রয়োগ, সম্ভাবনা এবং সমস্যা	৬৯-৭১
১২	দুগ্ধজাত গরুর রিপিট ব্রিডিং সমস্যা ও প্রতিকার	৭২-৭৪
১৩	গরুর খামার এর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	৭৫-৭৭

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের উন্নয়নে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী ও স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর অবদান অপরিসীম। অন্যান্য সকল অবদানের পাশাপাশি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের উন্নয়নে তিনি বিশেষভাবে অবদান রেখেছেন। জাতির পিতার এ সকল অবদানের ফলে দেশ আজ মাছ, মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে এবং অচিরেই দুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর অবদান সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

১. **মাছকে দ্বিতীয় প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী সম্পদ হিসেবে ঘোষণা:** দেশে প্রাণিজ আমিষের অন্যতম প্রধান উৎস হলো মাছ। তৎকালীন কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে মৎস্য খাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়টি তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাই ১৯৭২ সালের ৪ জুলাই কুমিল্লার এক জনসভায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা দিয়েছিলেন-
"মাছ হবে দ্বিতীয় প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী সম্পদ"।

২. **গণভবন লেকে পোনা অবমুক্তকরণ:** বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে মৎস্য খাতের গুরুত্ব অনুধাবন করে এ খাতের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। প্রাকৃতিক জলাশয়ে মৎস্য সম্পদের সম্ভাব্যতার কথা বিবেচনায় নিয়ে বঙ্গবন্ধু মৎস্য চাষের উপর গুরুত্বারোপ করেন। ১৯৭৩ সালে গণভবন লেকে মাছের পোনা অবমুক্ত করার মাধ্যমে অনুষ্ঠানিকভাবে মৎস্য চাষ কার্যক্রমের শুভ সূচনা করেন।

৩. **সরকারি চাকরিতে কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণির সম্মাননা প্রদান:** কৃষির উন্নয়ন হলেই দেশের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব হবে। ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহে বঙ্গবন্ধু বিশেষ ভাষণ দিয়েছিলেন। সে ভাষণে তিনি কৃষি বিপ্লবের কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন গ্রামের দিকে নজর দিতে হবে। কেননা গ্রামই সব উন্নয়নের মূল কেন্দ্র। গ্রামের উন্নয়ন আর অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি যখন বেগবান হবে তখন গোটা বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে সম্মুখপানে। মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কৃষি শিক্ষায় আকৃষ্ট করে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার মানসে জাতির পিতা এসময় কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণির পদমর্যাদা প্রদান করেন। তাঁর অদম্য ইচ্ছা ছিল যে কোনো উপায়ে কৃষকের স্বার্থরক্ষা করা।

৪. **মেরিন ফিশারিজ একাডেমি প্রতিষ্ঠা:** সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার সহায়তায় চট্টগ্রামের জলদিয়ায় "মেরিন ফিশারিজ একাডেমি" প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এ একাডেমি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে মেরিটাইম প্রতিষ্ঠান হিসেবে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ আহরণে দক্ষ জনবল তৈরি করছে।

৫. **গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ কার্যক্রম প্রবর্তন:** স্বাধীনতাপূর্ব (১৯৫৮-১৯৭১ সাল) সময়ে মৎস্য আহরণ সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রজাতির বৈচিত্র্য ও মৎস্য আহরণ এলাকার ওপর অনুসন্ধানমূলক জরিপ চালানো হয়। এ সময় ৪৭৫ প্রজাতির সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতি ও ৪টি মৎস্য বিচরণক্ষেত্র পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক এলাকায় সামুদ্রিক মৎস্য ও চিংড়িসম্পদের মজুদ সন্তোষজনক প্রতিভাত হওয়ায় স্বাধীনতার অব্যবহিত পর ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক সাবেক সোভিয়েত রাশিয়া হতে ১০টি ট্রলার অনুদান হিসেবে গ্রহণ করে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (BFDC) এর মাধ্যমে সর্বপ্রথম গভীর সমুদ্রে বাণিজ্যিক পরিসরে মৎস্য আহরণ শুরু করেন।

১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (BFDC) এবং জাতি সংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) উদ্যোগে সাগর সন্ধানী ও মীন সন্ধানী দ্বারা সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের জৈব জরিপ কার্যক্রম শুরু হয়। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ এর সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হওয়ায় ১৯৭০ দশকের মাঝামাঝি সময় দেশীয় এবং বিদেশী উদ্যোক্তাগণ মেরিন সেক্টরে মৎস্য আহরণে বিনিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে।

৬. **সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরকে বিভাগীয় দপ্তর হিসেবে মর্যাদা প্রদান:** সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠু এবং বিজ্ঞান সম্মতভাবে সহনশীল পর্যায়ে আহরণ নিশ্চিত করে মাছের বংশ বৃদ্ধি ও মজুদ অক্ষুন্ন রেখে যুগ যুগ ধরে সামুদ্রিক

মৎস্য উৎপাদন অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সালে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিবুর রহমান এক ঘোষণায় পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সকল আঞ্চলিক অফিসকে বিভাগ হিসেবে মর্যাদা প্রদান করেন। ফলে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর বিভাগ হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। সামুদ্রিক মৎস্য বিভাগটি এক পর্যায়ে শিল্প বিভাগের অধীনস্থ একটি দপ্তর হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। অবশেষে বাস্তব প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর মৎস্য অধীদপ্তরের অধীনস্থ একটি দপ্তর হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে।

৭. **ভূতাত্ত্বিক জলাশয় এবং মেরিটাইম জোনের আইন প্রণয়ন:** ১৯৭৪ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভূতাত্ত্বিক জলাশয় এবং মেরিটাইম জোন আইন প্রণয়ন করার মাধ্যমে সমুদ্র ও এর সম্পদসমূহের উপর বাংলাদেশের সার্বভৌম অধিকার ও দাবী প্রতিষ্ঠিত করেন। ফলে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ ভূখন্ডের জলবায়ু ও মেরিটাইম জোন আইনের গুরুত্বপূর্ণ বিধানগুলো UNCLOS এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৮. **সমুদ্রসীমা বিরোধ নিস্পত্তির মাধ্যমে সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ:** ১৯৭৪ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিবেশী দেশ ভারত ও মায়ানমার এর সাথে সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

৯. **প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে কৃত্রিম প্রজননে জাতির পিতার অবদান:** জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও উদ্যোগে ১৯৭৩ সালে অস্ট্রেলিয়া থেকে ১২৭টি হলিস্টিন ফ্রিজিয়ান ষাঁড় আনয়নের মাধ্যমে গবাদিপশুতে যুগান্তকারী কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তি প্রবর্তন ও ব্যপকভাবে সম্প্রসারণের মাধ্যমে গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির বহুমাত্রিক কার্যক্রম গ্রহণ করার ফলে দেশী গরুর উন্নয়ন ঘটেছে।

১০. **অন্যান্য:** জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পরবর্তী এক জনসভায় ঘোষণা করেন যে, "আমরা বাংলাদেশের মানুষ, আমার মাটি আছে, আমার সোনার বাংলা আছে, আমার পাট আছে, আমার মাছ আছে, আমার লাইভস্টক আছে। যদি ডেভেলপ করতে পারি ইনশাল্লাহ, এই দিন আমাদের থাকবে না।"

সামগ্রিক কৃষি উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর বৃহৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু বলেছেন সবার আগে দরকার আমাদের টোটাল জরিপ। জরিপ ছাড়া কোনো পরিকল্পনাই সফল হবে না। সেজন্য সব কাজ করার আগে আমাদের সুষ্ঠু জরিপ করতে হবে। জরিপের ওপর ভিত্তি করে আমাদের সার্বিক পরিকল্পনা করতে হবে।

বাংলাদেশে দুগ্ধ উৎপাদনকারী গরুর জাতসমূহ, দুধাল গাভী চেনার উপায় এবং একটি দুধাল গাভী মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয় সমূহ

জাত:

এটা একটি বিশেষ গোষ্ঠি, যার সদস্যরা একই চারিত্রিক বৈশিষ্টের অধিকারী এবং ঐ চারিত্রিক বৈশিষ্টগুলো বংশ পরম্পরায় ধারাবাহিকভাবে সন্তান সন্ততিতে সমভাবে বিদ্যমান। চারিত্রিক বৈশিষ্টগুলো যেমন: আকার-আকৃতি, গায়ের রং, দুধ উৎপাদন ক্ষমতা, দুধের গুণাগুণ, প্রজনন ক্ষমতা, কাজ করার ক্ষমতা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, পরিবেশ অভিযোজন, স্বভাব-প্রকৃতি, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি।

বাংলাদেশে দুগ্ধ উৎপাদনকারী গরুর জাতসমূহ:

১. দেশী গরুর জাত:

- রেড চিটাগাং গরু
- পাবনা গরু/ বিএলআরআই ক্যাটেল ব্রিড-১
- মুন্সীগঞ্জ গরু
- নন-ড্রেসক্রিপ্ট জাত

২. সংকর জাতের গরু:

- হলিস্টিন-ফ্রিজিয়ান × দেশী
- জার্সি × দেশী
- শাহীওয়াল × দেশী

৩. বিশুদ্ধ বিদেশী জাতের গরু:

- হলিস্টিন-ফ্রিজিয়ান
- জার্সি
- শাহীওয়াল

রেড চিটাগাং ক্যাটেল (আরসিসি) জাত:

সাধারনত বৃহত্তর চট্রগ্রাম এলাকাতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট ২০০২ সাল থেকে রেড চিটাগাং ক্যাটেল (আরসিসি) জাত সংরক্ষণ এবং বংশ পরম্পরায় নির্বাচিত প্রজননের মাধ্যমে আরসিসি জাত এর উন্নয়ন করা হয়েছে। এই জাতের গরু গায়ের লোম, চোখের পাপড়ি, নাক, শিং, ক্ষুর, লেজ এবং প্রজননাংগের বাহিরের অংশ লাল বর্নের হয়ে থাকে। প্রাপ্ত বয়স্ক ষাঁড়ের ওজন ৩০০-৩৫০ কেজি এবং প্রাপ্ত বয়স্ক গাভীর ওজন ১৬০-১৮০ কেজি।

অর্থনৈতিক গুরুত:

- পারিবারিক ও ক্ষুদ্র খামারী পর্যায়ে দুধ উৎপাদনের জন্য উপযোগী
- এই জাতের গাভী প্রতি বছরে একটি করে বাচ্চা দেয়
- দুধ উৎপাদনকাল ২৪০ দিন
- দুধ উৎপাদনকালে সর্বোচ্চ দুধ উৎপাদন ৮৫০ কেজি
- দৈনিক গড় দুধ উৎপাদন ৩.৫ কেজি
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি
- দুধে চর্বি ও ল্যাকটোজ বেশি থাকে
- ষাড় মোটাতাজাকরণের জন্য উপযোগী

আরসিসি জাতের গাভী

পাবনা গরু/ বিএলআরআই ক্যাটেল ব্রিড-১:

সাধারনত সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর এবং পাবনার বেড়া, সাথিয়া ও সদর উপজেলাতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) ১৯৯০ সালে পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলা থেকে দেশী জাতের গরু (পাবনা জাত) সংগ্রহ

করে এবং পরবর্তীতে উহাদের মধ্যে বংশ পরম্পরায় নির্বাচিত প্রজনন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিসিবি-১ জাতটি উদ্ভাবিত হয়েছে। এই জাতের গাভীগুলো সাধারনত লাল বর্ণের হয়ে থাকে। তবে সাদাটে এবং বাদামী বর্ণের গাভীও দেখা যায়। প্রাপ্ত বয়স্ক ষাঁড়গুলো গাঢ় লাল বর্নের হয় এবং উহাদের গলায় কালচে আভা থাকে। এই জাতের গরু চোখের পাপড়ি, নাক, শিং, ক্ষুর এবং লেজের গোছা কাল বর্ণের হয়ে থাকে। প্রাপ্ত বয়স্ক ষাঁড়ের ওজন ৪০০-৫০০ কেজি এবং প্রাপ্ত বয়স্ক গাভীর ওজন ২৫০-৩০০ কেজি।

পাবনা গরু/ বিএলআরআই ক্যাটেল ব্রিড-১

অর্থনৈতিক গুরুত্ব:

- পারিবারিক ও ক্ষুদ্র খামারী পর্যায়ে দুধ ও মাংস উৎপাদনের জন্য উপযোগী
- দুধ উৎপাদনকাল ২৬০ দিন
- দুধ উৎপাদনকালে গড় দুধ উৎপাদন ১২০০ কেজি
- দৈনিক গড় দুধ উৎপাদন ৪.৫ কেজি
- ষাড় মোটাতাজাকরণের জন্য উপযোগী
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি
- দেশীও আবহাওয়ায় পালন উপযোগী

মুন্সীগঞ্জ গরু:

পদ্মা নদীর অববাহিকায় বিশেষ করে মুন্সিগঞ্জ জেলা এবং এর সংলগ্ন জেলাতে পাওয়া যায়। এই জাতের গরুর গায়ের লোম, চোখের পাপড়ি, লেজের গোছা হালকা ঘিয়া হতে হালকা সাদা বর্ণের হয় এবং নাক, শিং, ক্ষুর, এবং প্রজননাংগের বাহিরের অংশ হালকা লাল বর্ণের হয়ে থাকে। প্রাপ্ত বয়স্ক ষাঁড়ের গলা থেকে কুজ পর্যন্ত লালচে আভা থাকে। প্রাপ্ত বয়স্ক ষাঁড়ের ওজন ৩০০-৪০০ কেজি এবং প্রাপ্ত বয়স্ক গাভীর ওজন ২০০-২৫০ কেজি।

মুন্সীগঞ্জ জাতের গাভী

অর্থনৈতিক গুরুত্ব:

- পারিবারিক ও ক্ষুদ্র খামারী পর্যায়ে দুধ ও মাংস উৎপাদনের জন্য উপযোগী
- গাভীগুলোর দৈনিক গড় দুধ উৎপাদন ৪.৫ থেকে ৫.৫ কেজি এবং কিছু গাভী ৮.০ কেজি পর্যন্ত দুধ দিয়ে থাকে
- প্রতি ল্যাকটেশনে দুধ উৎপাদন ক্ষমতা ১০০০-১২০০ লিটার
- এই জাতের গাভী ১২-১৩ মাস অন্তর একটি করে বাচ্চা দেয়
- ষাড় মোটাতাজা করণের জন্য উপযোগী এবং কোরবানীতে অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি
- দেশীও আবহাওয়ায় পালন উপযোগী

নর্থ-বেঙ্গল গ্রে গরু:

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের বিভিন্ন জেলাতে পাওয়া যায়। ভূমিহীন, ক্ষুদ্র কৃষক শ্রেণী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠি এই জাতটি বেশি পালন করে। এই জাতের গরুর গায়ের লোম ধুসর থেকে সাদাটে বর্ণের হয়ে থাকে। তবে হালকা ছাই বর্ণের গরুও পাওয়া যায়। এই জাতের গরু চোখের পাপড়ি, নাক, শিং, ক্ষুর এবং লেজের গোছা কাল বর্ণের হয়ে থাকে। প্রাপ্ত বয়স্ক ষাঁড়ের গলা থেকে কুজ পর্যন্ত এবং কিছু ক্ষেত্রে মেরুদন্ড বরাবর কালচে আভা থাকে। প্রাপ্ত বয়স্ক ষাঁড়ের ওজন ৩০০-৩৫০ কেজি এবং প্রাপ্ত বয়স্ক গাভীর ওজন ২০০-২৫০ কেজি।

নর্থ-বেঙ্গল গ্রে জাতের গরু

অর্থনৈতিক গুরুত্ব:

- পারিবারিক ও ক্ষুদ্র খামারী পর্যায়ে দুধ ও মাংস উৎপাদনের জন্য

উপযোগী

- গাভীগুলো দৈনিক ২.০ থেকে ৫.০ কেজি পর্যন্ত দুধ দিয়ে থাকে
- ষাড় মোটাতাজাকরণের জন্য উপযোগী
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি
- দেশীও আবহাওয়ায় পালন উপযোগী

হলিস্টিন ফ্রিজিয়ান সংকর:

এই জাতের উৎপত্তি নেদারল্যান্ডে, তবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাওয়া যায়। গাভীগুলো সাধারনত মিশ্র সাদা ও কাল বর্ণের হয়ে থাকে। তবে মিশ্র সাদা ও লাল বর্ণের গাভীও দেখা যায়। বাংলাদেশের সংকর জাতের গাভীর দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে

এই জাতের ষাঁড়ের বীজ গাভীর কৃত্রিম প্রজননে ব্যবহার হয়। আমাদের দেশের প্রজনন নীতিমালা অনুযায়ী ৫০% হলিস্টিন ফ্রিজিয়ান এবং ৫০% দেশী গরু আমাদের দেশীও আবহাওয়ায় পালন উপযোগী। সংকর গরুতে ৫০% এর বেশী হলিস্টিন ফ্রিজিয়ান থাকলে, তাদের পরিবেশ অভিযোজন ক্ষমতা হ্রাস পায়।

হলিস্টিন ফ্রিজিয়ান সংকর জাতের গাভী

অর্থনৈতিক গুরুত্ব:

- দুধ উৎপাদনে জন্য উপযোগী
- দুধ উৎপাদনকাল ৩০৫ দিন
- দুধ উৎপাদনকালে গড় দুধ উৎপাদন ১০০০০ কেজি
- দৈনিক গড় দুধ উৎপাদন প্রায় ৩২ কেজি

জার্সি সংকর:

এই জাতের উৎপত্তি ইংলিশ চ্যানেলের জার্সি আইল্যান্ডে। গাভীগুলো সাধারনত হালকা থেকে গাঢ় বাদামী বর্ণের হয়ে থাকে, তবে অনেক সময় সাদা রঙের ছোপ দেখা যায়। বাংলাদেশের দেশী জাতের গাভীর দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই জাতের ষাঁড়ের বীজ গাভীর কৃত্রিম প্রজননে ব্যবহার হয়। সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে "মিল্কভিটা" এই জাতের ষাঁড় আমদানির মাধ্যমে ঐ এলাকাতে কৃত্রিম প্রজননের কাজ করছে।

জার্সি সংকর জাতের গাভী

অর্থনৈতিক গুরুত্ব:

- দুধ উৎপাদনে জন্য উপযোগী
- দুধ উৎপাদনকাল ৩০৫ দিন
- দুধ উৎপাদনকালে গড় দুধ উৎপাদন ৬০০০ কেজি
- দৈনিক গড় দুধ উৎপাদন প্রায় ২০ কেজি

শাহীওয়াল সংকর:

এই জাতের উৎপত্তি পাকিস্তানে। পাকিস্তানের শাহীওয়াল জেলার নাম অনুসারে এই গরুর নামকরণ করা হয়েছে। গাভীগুলো সাধারনত লাল বর্ণের হয়ে থাকে। প্রাপ্ত বয়স্ক ষাঁড়গুলো গাঢ় লাল বর্ণের হয় এবং উহাদের গলায় এবং দেহের পিছনের অংশে কালচে আভা থাকে। আমাদের দেশের প্রজনন নীতিমালা অনুযায়ী দেশী জাতের গাভীর দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই জাতের ষাঁড়ের বীজ গাভীর কৃত্রিম প্রজননে ব্যবহার হয়। এই জাতের গরু আমাদের দেশীয় আবহাওয়ায় পালন উপযোগী।

শাহীওয়াল সংকর জাতের গাভী

অর্থনৈতিক গুরুত্ব:

- পারিবারিক ও ক্ষুদ্র খামারী পর্যায়ে দুধ ও মাংস উৎপাদনে জন্য উপযোগী
- দুধ উৎপাদনকাল ৩০৫ দিন
- দুধ উৎপাদনকালে গড় দুধ উৎপাদন ২৫০০ কেজি
- দৈনিক গড় দুধ উৎপাদন প্রায় ৮ কেজি

দুধাল গাভী চেনার উপায় এবং দুধাল গাভী মূল্যায়নের বিবেচ্য বিষয়

গাভী ডেইরী ফার্ম হইতে ক্রয় করিলে নিম্নোক্ত সঠিক তথ্য পাওয়া যায়, কিন্তু বাজার হইতে ক্রয় করিলে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

১. বংশ ইতিহাস ও বংশধরদের উৎপাদন ক্ষমতা:

দুধাল জাতের গবাদি পশুর বাছ-বিচার করার জন্য বংশ ইতিহাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গাভীর মাতা-পিতা উভয়ই যদি উপযুক্ত গুণ সম্পন্ন হয় তবে বাছুরও ভাল হয়। দুধাল গাভীর উপযুক্ত মূল্যায়নের জন্য উহার বংশধরদের উৎপাদন ক্ষমতা ও গুণাবলীর নির্ভরযোগ্য নথিপত্র খুবই সহায়ক।

২. নিজস্ব উৎপাদন ক্ষমতা:

গাভী নির্বাচনে নিজস্ব উৎপাদন ক্ষমতা অত্যন্ত জরুরী। ইহা সাধারণত: বাচ্চা প্রসবের পর পরিমাপ হয়।

গাভীর সঠিক মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা সাপেক্ষ্য:

বৈশিষ্ট্য	পূর্ণমাণ	গাভী
(ক) দেহের গঠন (Frame): গাভীসুলভ আকৃতি, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও নিখুঁত অঙ্গ প্রতঙ্গ, সুন্দর ও আকর্ষণীয় গতিবিধি। অর্থাৎ সম্মুখভাগ সরু ও দেহের পশ্চাৎ ভাগ প্রশস্থ হবে। কোমরের অংশ লম্বা ও প্রশস্থ হবে। পিন বোন, হিপ বোন থেকে নিচু হবে। যৌনাঙ্গ শরীরের সাথে প্রায় লম্ব ভাবে থাকবে এবং পায়ু পথ কোটরের ভেতরে থাকবে না। লেজের গোড়া কিছুটা উঁচু এবং পরিচ্ছন্ন থাকবে। শিরদাঁড়া সোজা ও মজবুত হবে।	১৫	
(খ) দুধাল বৈশিষ্ট্য (Dairy strength): ঢিলেঢালা শরীর, চামড়া পাতলা, মেদ মুক্ত ও অপ্রয়োজনীয় পেশী মুক্ত হবে। দেহের আকার অনুযায়ী বুকের ও পেটের বেড় গভীর বা বড় হবে। পাঁজরের হাড় গুলি ফাঁকা-ফাঁকা এবং স্ফীত হবে।	২৫	
(গ) পিছনের ও সামনের পা (Rear feet and legs): পা মজবুত, সোজা, সমান্তরাল ও চতুষ্কোনাকারে সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ক্ষুর হইবে সুন্দর গোলাকৃতি এবং মোটা গোড়ালী ও পায়ের পাতা সমান। বিশেষ করিয়া পিছনের পাদ্বয় হইবে সোজা এবং একটি হইতে অন্যটি বেশ পৃথক।	২০	
(ঘ) ওলানের বৈশিষ্ট্য (Udder): ওলানের গঠন হবে বেশ বড়, সুন্দর, শরীরের সঙ্গে শক্ত ভাবে আটকানো এবং অধিক দুগ্ধ ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন। ওলানের বাঁট গুলি হবে একই আকারের, সমান্তরাল ভাবে সাজানো এবং ক্ষুব বড় বা ছোট হবে না। দুধনালী গুলো আঁকা-বাঁকা হবে এবং দূর থেকে স্পষ্ট দেখা যাবে। ওলান গঠন বড় হবে, তবে দুধ দোহনের পরে সংকুচিত হয়ে যাবে।	৪০	
মোট	১০০	

দুধাল গাভী সঠিক দৈহিক বৈশিষ্ট্যের চিত্র

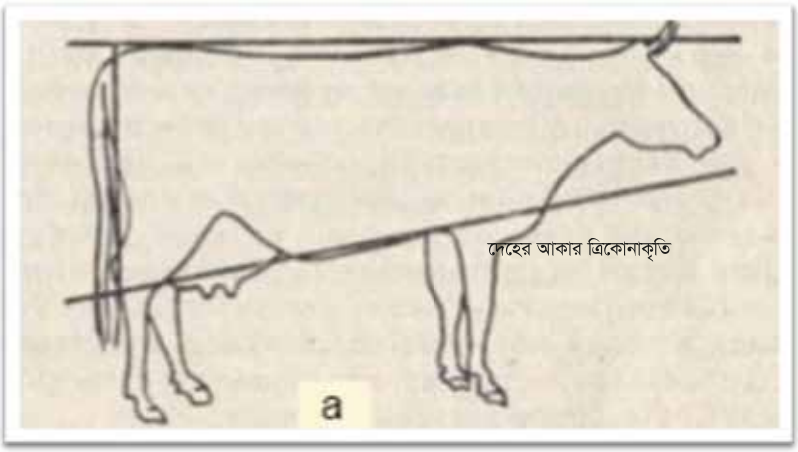

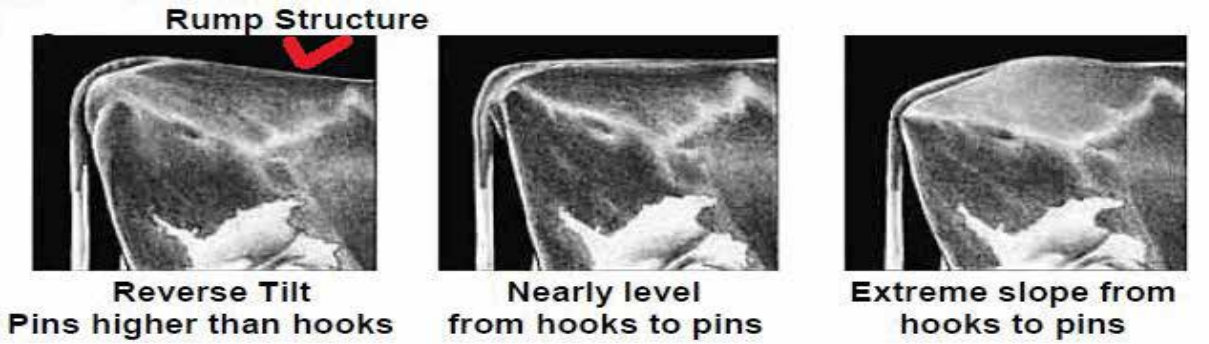

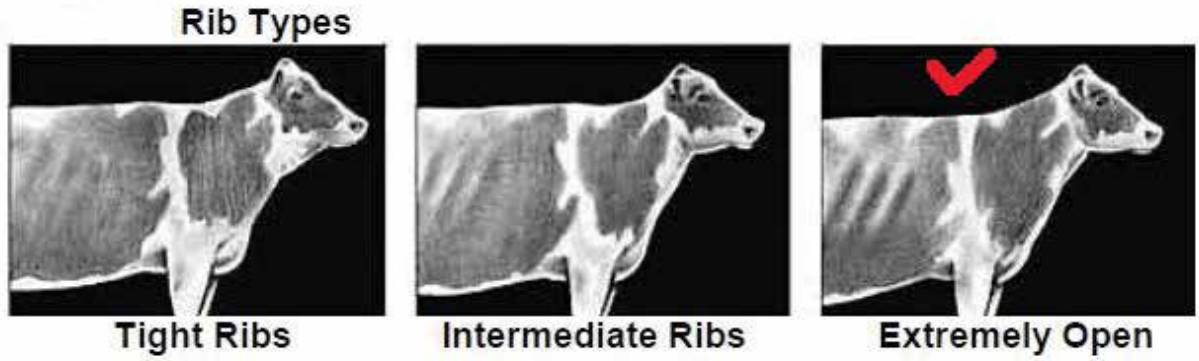

Foot angle

Low | Intermediate | Steep

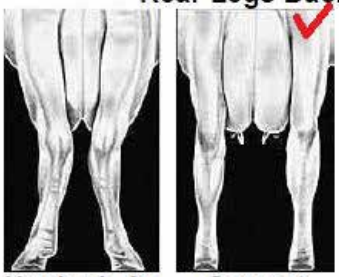

Rear Legs Back View | **Rear Legs Side View**

Hocked –in | Correct | Post-legged | Correct | Sickle-hocked

Rear Udder Height

Low | Intermediate | High

Fore Udder Attachment

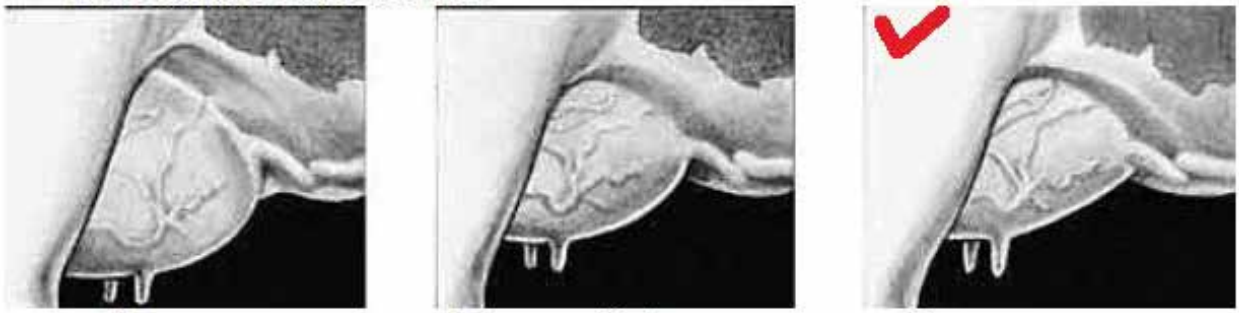

Loose | Intermediate | Strong

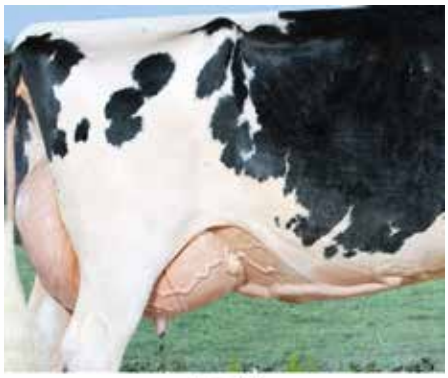

দুগ্ধনালী

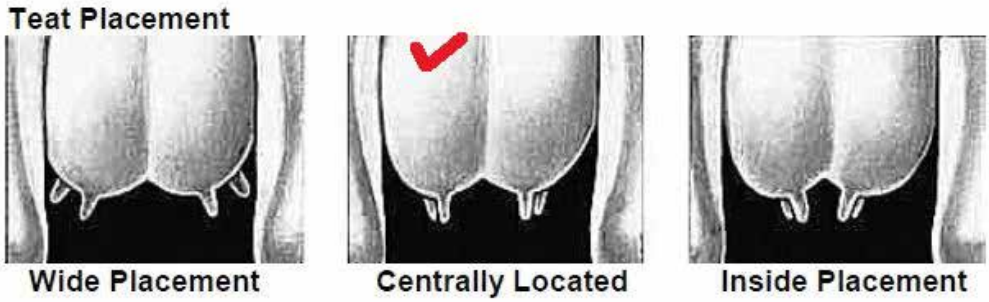

Copyrighted by the Purebred Dairy Cattle Association, 1943. Revised and copyrighted 1957, 1971, 1982, 1994 and 2009.

দুগ্ধ উৎপাদনকারী গাভীর জন্য বাসস্থান নির্মাণের বিবেচ্য বিষয়সমূহ এবং নির্মাণ কৌশল

পশুর বাসগৃহঃ

বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ রৌদ্র , বৃষ্টিপাত, বন্যপ্রাণী, পোকা মাকড়, চোর, অত্যধিক গরম, অত্যধিক ঠান্ডা প্রভৃতি হইতে পশুকে রক্ষার জন্য এবং পশুর বিশ্রাম ও ঘুমাইবার জন্য যে গৃহ নির্মাণ করা হয় তাহাকে পশুর বাস গৃহ বলে। যখন ইহারা বন্যজীবন যাপন করে তখন নিজেদেরকে শত্রু এবং প্রতিকূল আবহাওয়া হইতে রক্ষা করার জন্য ক্ষমতা রাখে। কিন্তু যখনই ইহারা পোষ্য হয় তখন এই ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে। ফলে ইহাদেরকে বাসগৃহ প্রদান আবশ্যক হয়ে পড়ে।

বাসস্থানের প্রয়োজনীয়তাঃ

০১. রোদ, বৃষ্টি, ঝড়, শীত ও নানা প্রাকৃতিক প্রতিকূল অবস্থা থেকে গরুকে রক্ষার জন্য
০২. পোকামাকড় ও ক্ষতিকর বন্যপ্রাণীর আক্রমন থেকে প্রাণীকে বাঁচানোর জন্য
০৩. সু-শৃঙ্খলভাবে খাদ্য ব্যবস্থাপনা, শ্রম ব্যবস্থাপনা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য
০৪. গোবর ও খাদ্য পরিশিষ্ট সংগ্রহ ও ব্যবহার সঠিকভাবে করার জন্য
০৫. সবগুলো গরুকে একবারে পরিদর্শন করা যায়
০৬. প্রয়োজনে পৃথকভাবে প্রাণীর সেবা করা যায়
০৭. অসুস্থ গরুকে দ্রুত চিহ্নিতকরণ ও পৃথক করা যায়
০৮. গরুকে সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায়
০৯. উন্নত আরামপ্রদ অবস্থা প্রদানের জন্য
১০. উন্নততর ব্যবস্থাপনা এবং যত্ন
১১. সরবরাহকৃত খাদ্যের মান উন্নয়ন
১২. উন্নত সেবা প্রদান
১৩. উন্নত গ্রুমিং ব্যবস্থা
১৪. আধুনিক প্রজনন

নিম্নলিখিত প্রয়োজন গুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে গরুর ঘর তৈরি করা উচিতঃ-

১. স্বাস্থ্য এবং পশুর আরাম
২. শ্রমের দক্ষতা, সুবিধাজনক শ্রমের প্রাপ্যতা এবং দ্রব্যাদির ব্যবহার
৩. উপযুক্ত স্বাস্থ্যগত নিয়মাবলী সম্পন্ন- যেমনঃ
   ক. জায়গা
   খ. আলো
   গ. বায়ু চলাচল
   ঘ. প্রাণীর ও পরিচারকের স্বাস্থ্য
   ঙ. নিষ্কাশন
৪. শ্রমের দক্ষতা, সুবিধাজনক শ্রম এবং দ্রব্যাদির ব্যবহার
৫. পশুর চিকিৎসা এবং অন্যান্য ব্যবস্থাপনার জন্য সহজ প্রবেশ্যতা থাকতে হইবে

খ) ঘর নির্বাচনঃ

১. ঘরের মধ্যে পর্যাপ্ত আলো ও বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে
২. ঘরের মল-মূত্র ও অন্যান্য আর্বজনা যাতে সহজেই পরিস্কার করা যায় সে দিকে খেয়াল রেখে ঘর তৈরী করতে হবে
৩. ঘরের মেঝে ড্রেনের দিকে ঢালু থাকবে এবং অমসৃণ হতে হবে যাতে গরু বা মানুষ চলাচলের সময় পিছলে না যায়

একটি ঘর তৈরীর নমুনাঃ

আমাদের দেশে ক্ষুদ্র খামারীরা সাধারনতঃ ২/৩ টি গরু নিয়ে খামার করে থাকে এর জন্য অধিক টাকা খরচ করে ঘর করার প্রয়োজন পরেনা। তবে বেশি সংখ্যায় অর্থাৎ বাণিজ্যিক ভাবে দুগ্ধ উৎপাদনের জন্য গাভী পালন করলে অবশ্য অবশ্যই বিজ্ঞান সম্মত, স্বাস্থ্যকর ও আধুনিক ঘর তৈরী করার দরকার পড়ে। নিচের ছবিতে ৪০ টি গরুর জন্য দুই সারির একটি ঘর তৈরীর

পরিকল্পনা করে দেওয়া হল। এই জাতীয় ঘরে দুই সারিতে ২০ টি করে মোট ৪০ টি গরু থাকতে পারবে। গরুগুলো ঘরের ভিতরের দিকে মুখ করে থাকবে। প্রতিটি গরুর দাঁড়ানোর জায়গা (স্টল) হবে ৫.৫ ফুট লম্বা ও ৩.৫ ফুট চওড়া। গরুর সন্মুখে ২.৫ ফুট চওড়া একটি চাড়ি এবং পিছনে ১ ফুট চওড়া একটি ড্রেন বা নালা থাকবে। ঘরের মাঝখানে থাকবে ৬ ফুট চওড়া একটি রাস্তা যার উপর দিয়ে খাদ্য পরিবহন করা হবে। গরুর সংখ্যা আরও বাড়ালে শুধু দৈর্ঘ্য বরাবর প্রতি জোড়া গরুর জন্য ৩.৫ ফুট করে এই ঘর বাড়ালেই চলবে। প্রস্থ বরাবর ঘর বাড়ানোর দরকার হবেনা।

গরুর ঘর প্রধানত: দুই প্রকারের বহুল প্রচলিত, যথা (১) বাধা ঘর (২) উদাম ঘর

দুই সারি বিশিষ্ট বহির্মুখী বাধা ঘর

১. খাদ্য সরবরাহ পথ - ১২০ সেন্টিমিটার (৪ ফুট)
২. চাড়ি - ৭৫ সেমি (২.৫ ফুট)
৩. প্রাণী দাঁড়াবার স্থান ১৫০ সেমি (৫.৫ ফুট)
৪. নর্দমা - ৩০ সেমি(১ ফুট)
৫. পশু চলাচলের পথ ২৪০ সেমি (৮ ফুট)
৬. নর্দমা
৭. প্রাণী দাঁড়াবার স্থান
৮. চাড়ি
৯. খাদ্য সরবরাহ পথ

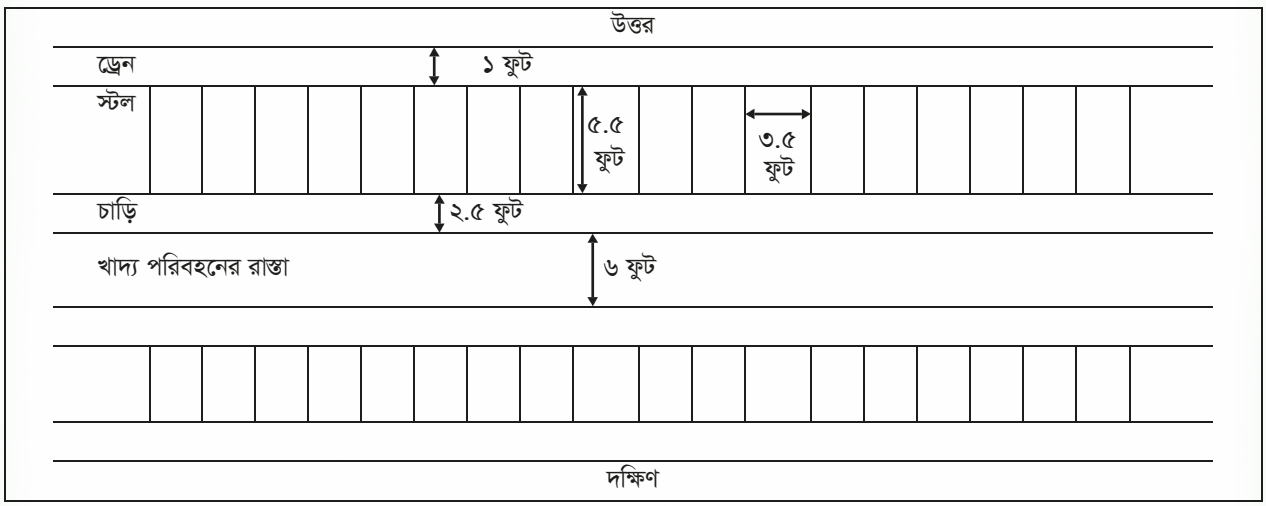

চিত্র: ৪০ টি গরুর জন্য ঘরের পরিকল্পনা

বহির্মুখ গোশালার সুবিধা:

১. গোবর ও আবর্জনা পরিস্কারের জন্য অধিকতর উপযোগী
২. দুগ্ধ দোহন সুবিধা
৩. সকল গাভীর পশ্চাদভাগ দেখা সহজতর
৪. একবারে সকল গাভীকে পরিদর্শন করা যায়
৫. ঘরের দেওয়াল সহজে পরিস্কার রাখা যায়
৬. একইপথে গরু ঘরে ও বাহিরে আসা যাওয়া করতে পারে

একটি বহির্মুখ গোশালা

বহির্মুখ গোশালার অসুবিধা:

১. জায়গা আপেক্ষাকৃত বেশী প্রয়োজন, ফলে খরচ বেশী পড়ে
২. দোহনের সময় আলো পাওয়া যায় না
৩. ওলানে ক্ষত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি

অন্তর্মুখ গোশালার সুবিধা:

১. খাদ্যদ্রব্যাদি সরবরাহ সহজতর
২. দোহনের সময় প্রয়োজনোতিরিক্ত আলো পাবার সম্ভাবনা
৩. জায়গা কম প্রয়োজন

একটি অন্তর্মুখ গোশালা

অন্তর্মুখ গোশালার অসুবিধা:

১. সকল গরুকে একবারে পরিদর্শন করা যায় না
২. গরুর শরীরে বাহিরের ময়লা লাগার সম্ভাবনা বেশি

উদাম ঘরের সুবিধা: (ফ্লোর স্পেস: ৮০-১০০বর্গ ফুট; চাড়ির দৈর্ঘ: ২০-২৪ ইঞ্চি)

ক) নির্মাণ খরচ কম এবং কম শ্রমিক প্রয়োজন
খ) লালন পালনে খুবই সুবিধা
গ) ওলান ও পায়ে আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা কম
ঘ) গরুগুলো নিজের ইচ্ছামত ঘোরাফেরা করতে পারে

উদাম ঘরের অসুবিধা:

ক) দুর্বল গরু সবল গরুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে খেতে পারে না, ফলে আরও দুর্বল হয়ে পড়ে
খ) মারামারি করার সম্ভাবনা বেশি

বাঁধা ঘর পদ্ধতির সুবিধা: (ফ্লোর স্পেস: ২০-৩০বর্গ ফুট; চাড়ির দৈর্ঘ: ২০-২৪ ইঞ্চি)

ক) গাভীগুলি পরিদর্শন বা পরীক্ষা করা খুবই সুবিধাজনক
খ) বিছানার জন্য কম খরচ হয়
গ) একই ঘরে গাভী দোহন করা যায়
ঘ) চিকিৎসা ও কৃত্রিম প্রজননের জন্য সুবিধাজনক

বাঁধা ঘর পদ্ধতির অসুবিধা:

ক) নির্মাণ খরচ বেশি এবং বেশি শ্রমিক প্রয়োজন
খ) স্বেচ্ছায় ঘোরাফেরা করতে পারে না

গাভী ও বাছুরের বিভিন্ন ধরণের রোগসমূহ (ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস) ও উহার প্রতিকার

গবাদি প্রাণী পালন আমাদের দেশের মানুষের আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস আর এই আয় বৃদ্ধির একটি অন্যতম অন্তরায় হচ্ছে এদের বিভিন্ন প্রকার রোগে আক্রান্ত হওয়া। রোগের কারণে কিছু প্রাণী মারা যায় আর যে সকল প্রাণী সুস্থ হয়ে ওঠে তাদের উৎপাদন ক্ষমতা অনেক সময় কমে যায়। তাছাড়া রোগাক্রান্ত প্রাণির চিকিৎসা করতে অনেক টাকা খরচ হয়। তাই প্রাণিসম্পদকে সুস্থ সবল রাখা খামারীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমাদের দেশে গরু ও মহিষের বিভিন্ন রোগ থাকলেও তার মধ্যে কয়েকটি রোগের নাম এবং এদের আক্রান্ত হওয়ার কারণ নামসহ নিচে ছক আকারে দেওয়া হলো এবং এর মধ্যে প্রধান কয়েকটি রোগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

রোগের প্রকার	রোগের নাম	জীবাণু/কারণ
ভাইরাসজনিত রোগ	ক্ষুরা রোগ/এফএমডি	ফুট এন্ড মাউথ ডিজিজ ভাইরাস
ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ	তড়কা রোগ/অ্যানথ্রাক্স	ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস
	বাদলা রোগ	ক্লোসট্রিডিয়াম চৌভি
	গলাফুলা রোগ	পাসচুরেলা মালটোসিডা
কৃমিজনিত রোগ	থ্যাসিওলোসিস	ফ্যাসিওলা জায়গানটিকা
	হাম্পসোর	স্টেফানোফিলেরিয়া আসামেনসিস
প্রোটোজোয়া ঘটিত রোগ	এনাপ্লাজমোসিস	এনাপ্লাজমা মার্জিনালি
	ব্যাবিসিওসিস	ব্যাবিসিয়া বাইজেমিনা
পুষ্টির অভাবজনিত রোগ	মিল্কফিভার	ক্যালসিয়ামের অভাব
	কিটোসিস	অতিরিক্ত কিটোন বডি তৈরী
	হাইপোম্যাগনেসেমিক টিটেনী	ম্যাগনেসিয়ামের অভাব
জননতন্ত্রের রোগ	পুণ: গরম হওয়া	নানাবিধ কারণ
	গরম না হওয়া	পুষ্টির অভাব
	জরায়ুর সংক্রমণ	বিভিন্ন প্রকার ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ
	গর্ভপাত	জীবাণু দ্বারা সংক্রমণ
	ফুল না পড়া	বিভিন্ন কারণ
	প্রসব কষ্ট	বিভিন্ন কারণ
	ডিম্বাশয়ের সিস্ট	হরমোনজনিত সমস্যা
ওলানের রোগ	ওলান পাকা বা ম্যাস্টাইটিস	জীবানু সংক্রমণ
বিষক্রিয়াজনিত রোগ	ইউরিয়া বিষক্রিয়া	অতিরিক্ত পরিমাণে ইউরিয়া গ্রহণ
	নাইট্রেট বিষক্রিয়া	নাইট্রেট যুক্ত ঘাস খাওয়া

১. ক্ষুরারোগ (FMD)

ক্ষুরারোগ বিভক্ত ক্ষুর বিশিষ্ট পশুর অত্যন্ত তীব্র ছোঁয়াচে প্রকৃতির ভাইরাসজনিত রোগ। জ্বর, মুখ ও পায়ে ফোস্কা এ রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশে প্রতি বছর ক্ষুরারোগের কারণে বিপুল পরিমাণে আর্থিক ক্ষতি হয়।

ক্ষুরারোগ (FMD)

কারণ:

ফুট এ্যান্ড মাউথ ডিজিজ ভাইরাস এর তিনটি স্ট্রেইনের (A, O, Asia-1) দ্বারা আমাদের দেশে এ রোগটি হয়। প্রধানত এ ভাইরাস শ্বাস-প্রশ্বাস ও খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করে।

লক্ষণ:

প্রথমে জ্বর হয় এবং মুখ, পা ও বাটে রসভরা ফোস্কার সৃষ্টি করে। খাদ্য গ্রহণের ফলে মুখের ভেতরে ও জিহ্বার ফোস্কা ছিড়ে ক্ষত সৃষ্টি হয়। প্রদাহের ফলে মুখ থেকে প্রচুর লালা ঝরে, দুই পায়ের ক্ষুরের মাঝে ক্ষত সৃষ্টি হয়।

রোগ নির্ণয়:

বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপসর্গ (জ্বর, মুখ দিয়ে লালা ঝরা, মুখ ও পায়ে ফোসকা, খোঁড়ানো)। সুনির্দিষ্ট রোগ নির্ণয়ের জন্য এলাইজা, পিসিআর পরীক্ষার মাধ্যমে ভাইরাস সনাক্তকরণ।

চিকিৎসা:

- মৃদু জীবাণুনাশক পদার্থ দ্বারা মুখ ও পায়ের ক্ষত পরিষ্কার করতে হবে
- ক্ষুরারোগ জীবাণুর জটিলতা রোধে অ্যান্টিবায়োটিক অথবা সালফোনামাইড ইনজেকশন দিলে সুফল পাওয়া যায়
- আক্রান্ত প্রাণীকে শুকনো ও পরিষ্কার স্থানে রাখতে হবে এবং নরম খাবার দিতে হবে

নিয়ন্ত্রণ:

- ৪৫ দিন বয়স প্রথম টিকা এর দুই মাস পর বুস্টার দিয়ে প্রতি ৬ মাস পর পর এরোগের টিকা প্রদান করতে হবে কোন এলাকায় রোগটির প্রাদূর্ভাব বেশী থাকলে প্রতি ৪ মাস পর পর টিকা দেওয়া উচিত।
- রোগাক্রান্ত প্রাণীকে সুস্থ পশু থেকে আলাদা করতে হবে এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।
- মৃত প্রাণীকে গভীর গর্ত করে মাটিতে পুতে ফেলতে হবে, কোনক্রমেই খোলা মাঠে ফেলে রাখা যাবে না।

২. তড়কা রোগ (Anthrax)

তড়কা রোগ বা অ্যানথ্রাক্স ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস (Bacillus anthracis) নামক স্পোর তৈরি করে এমন একটি ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট গবাদি প্রাণীর একটি অতিতীব্র প্রকৃতির মারাত্মক জুনোটিক রোগ। রোগটি প্রাণী থেকে মানুষে ছড়াতে পারে এবং তীব্র প্রকৃতির রোগ সৃষ্টি করে। মানুষ সাধারণত আক্রান্ত প্রাণীর সংস্পর্শে আসা বা মাংস, চামড়া বা অন্যান্য উপজাত নিয়ে কাজ করার সময় এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

তরকা রোগ (anthrax)

রোগের লক্ষণ:

স্বাভাবিক অবস্থায় এ রোগের সুপ্তিকাল নির্ণয় করা সম্ভব হয়না। তবে খুব সম্ভবত ১-২ সপ্তাহ ধরা হয়।

ক) অতি তীব্র প্রকৃতি (Peracute form)

- অধিকাংশ ক্ষেত্রে লক্ষণ প্রকাশের আগে মারা যায়,
- কখনও কখনও ১-২ ঘন্টা স্থায়ী হয়

খ) তীব্র প্রকৃতি (Acute form)

- জ্বর (১০৪°-১০৭°), ক্ষুধামান্দ্য, নিস্তেজতা, দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস, পেট ফাঁপা, গর্ভপাত, দেহের কাঁপুনি, রুমেনের গতি কমে যায়, নাক, মুখ, প্রস্রাব ও মলদ্বার দিয়ে রক্ত ক্ষরণ হতে দেখা যায় ও শরীরের ভিতরে বিভিন্ন অঙ্গে রক্তক্ষরণ হয়

রোগ নির্ণয়:

গবাদি প্রাণীর হঠাৎ মৃত্যুর ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রদর্শিত উপসর্গ দেখে এ রোগ সম্পর্কে ধারণা করা যায়। সুনির্দিষ্টভাবে এ রোগ নির্ণয়ের জন্য আক্রান্ত প্রাণীর কানের রক্ত ও স্থানিক এডিমার তরল নিয়ে স্লাইডে স্মেয়ার করে তাপে ফিক্সড করে ১% পলিক্রম মিথিলিন ব্লু এবং গ্রামস স্টেইন দ্বারা রঞ্জিত করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে পরীক্ষা করলে গ্রাম পজেটিভ দন্ডাকৃতির ব্যাকটেরিয়া ধরা পড়ে। পলিক্রম মিথিলিন ব্লু স্লাইডে এ রোগের জীবাণু আকাশী বর্ণের এবং তার চারপাশে ক্যাপসুল দানাদার রেড পারপল বর্ণের দেখায়।

মৃত প্রাণীর বিভিন্ন প্যাথোলজিক্যাল পরিবর্তন দেখেও রোগ সনাক্ত করা যায়, যেমন:

- এরোগে মৃত প্রাণীর দ্রুত পচন আরম্ভ হয় ও পেট ফাঁপা থাকে
- দেহের স্বাভাবিক ছিদ্র পথ দিয়ে আলকাতরার ন্যায় কালো রক্ত বের হয় এবং রক্ত জমাট বাধে না

চিকিৎসা:

তড়কা রোগের চিকিৎসায় এন্টিসিরাম ও এন্টিবায়োটিক ভাল কাজ করে। এন্টিসিরাম পাওয়া গেলে ১০০-২৫০ মিলি হিসেবে প্রতিটি আক্রান্ত গরুতে প্রত্যহ শিরায় ইনজেকশন দিতে হবে। তবে একই সময়ে এন্টিসিরাম ও এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন অধিক কার্যকর। পেনিসিলিন জাতীয় ঔষধ প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ১০,০০০ ইউনিট করে মাংস পেশীতে দিনে দুইবার করে ৫ দিন ইনজেকশন দিতে হয়।

নিয়ন্ত্রণ:

রোগাক্রান্ত প্রাণীকে সুস্থ প্রাণী থেকে পৃথক রেখে চিকিৎসা ও সুস্থ প্রাণীকে টিকা প্রদান করতে হবে। মড়কের সময় প্রাণীর চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। শুষ্ক ও পরিছন্ন অবস্থায় পালন করতে হবে। আক্রান্ত প্রাণীকে যথাযথ চিকিৎসা ও সুস্থ প্রাণীকে নিয়মিত টিকা প্রদান করতে হবে। এ রোগ প্রতিরোধে ১ মিলি চামড়ার নিচে ইনজেকশন দিতে হবে এবং প্রতিবছর একবার করে প্রয়োগ করতে হবে। খামারী প্রাণিসম্পদ অফিসে খবর দিয়ে নিজের করণীয় সম্পর্কে জানতে পারেন। এ রোগে মৃত পশুর দেহ কাটা ছেড়া করা উচিত নয় তাতে করে জীবাণু ছড়িয়ে যেতে পারে। মৃত প্রাণী ও প্রাণীর শরীর থেকে নির্গত রক্ত ও মল, মূত্র গভীর গর্ত করে চুন সহকারে পুতে ফেলতে হবে। পরে প্রাণীর আবাস স্থল ১০% ফরমালডিহাইড দিয়ে জীবাণু মুক্ত করতে হবে।

৩. বাদলা রোগ (B.Q)

বাংলাদেশে প্রাণীর এ রোগ বৃষ্টি বাদলের দিনে হয় বলে একে বাদলা রোগ বলে। প্রধানত এ রোগে পা আক্রান্ত হয় তাই একে ব্ল্যাক লেগ (Black leg) বলে। ক্লস্টিডিয়ার্ম শোভিয়াই জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট এ রোগ প্রধানত বাড়ন্ত বয়সের প্রাণীর একটি তীব্র প্রকৃতির সংক্রামক রোগ।

বাদলা রোগ (B.Q)

লক্ষণ:

এ রোগের সুপ্তিকাল ১-৭ দিন। অতি তীব্র ও তীব্র এই দুই প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পায়। অতি তীব্র প্রকৃতির রোগে আক্রান্ত প্রাণী হঠাৎ করে মারা যায়। মৃত্যু আকস্মিক না হলে ক্ষুধামান্দ্য, জ্বর (১০৪-১০৭° ফাঃ), পেটে গ্যাস, নাকে শেম্মা, অবসাদভাব ইত্যাদি প্রকাশ পায়। উপসর্গ প্রকাশের ১২-৩৬ ঘন্টার মধ্যে প্রাণী মারা যায়। তীব্র প্রকৃতির রোগে অতি তীব্র প্রকৃতির ন্যায় উপসর্গ ছাড়াও পায়ের মাংশ পেশী আক্রান্ত হয়। ফলে প্রাণী হাটতে পারে না এবং খুড়িয়ে হাটে। আক্রান্ত মাংসপেশী কিছু ফোলা থাকে এবং টিপলে পচপচ শব্দ হয়। উপসর্গ প্রকাশের ১৮-৭২ ঘন্টার মধ্যে প্রাণীর মৃত্যু ঘটে। বেঁচে যাওয়া প্রাণীর মাংসে পচন ধরে এবং খসে পড়ে এবং সম্পূর্ণ ভাল হতে ১-২ মাস সময় লাগে।

রোগ নির্ণয়:

- প্রধানত ৬ মাস থেকে ২ বছর বয়স্ক গরু আক্রান্ত হবার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপসর্গ (জ্বর, খোড়ানো এবং আক্রান্ত পেশী টিপলে পচপচ শব্দ)
- সুনির্দিষ্টভাবে রোগ নির্ণয়ের জন্য ক্ষতস্থানের পেশী নিডিল দিয়ে ছিদ্র করে ফ্লুইড নিয়ে স্মিয়ার গ্রামস স্টেইন করলে গ্রাম পজেটিভ ব্যাকটেরিয়া পাওয়া যাবে।

চিকিৎসা:
প্রতিকেজি দৈহিক ওজনের জন্য ১০,০০০ আই ইউ পেনিসিলিন ইনজেকশন দিতে হয়। প্রথমে ক্রিস্টালিন পেনিসিলিন শিরায় ইনজেকশন দিয়ে পরবর্তী মাত্রার প্রোকেইন পেনিসিলিন অর্ধেক মাত্রায় আক্রান্ত পেশীতে এবং মাংসপেশীতে দিনে দুইবার করে ৫-৭ দিন ইনজেকশন দিতে হবে।

নিয়ন্ত্রণ:
তিন মাসের বেশি বয়সী গরুর ত্বকের নিচে ৫ মিলি বাদলা রোগের টিকা ইনজেকশন দিলে ১৪ দিনে দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করে ।

৪. গলাফোলা (H.S):

গলাফোলা গবাদিপশুর বিশেষ করে মহিষের একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ। ইংরেজীতে এই রোগটিকে বলা হয় Haemorrhagic Septicemia. এটি একটি ছোঁয়াচে রোগ এবং এ রোগে মৃত্যুর হার অনেক বেশি। বর্ষাকালেই গলাফোলা রোগের সংক্রমণ বেশি দেখা যায়।

গলাফোলা (H.S) রোগ

রোগের কারণ: Pasturella Multocida type-১ নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা রোগটি হয়ে থাকে।

সংক্রমণ: সাধারণত প্রাণীর উর্ধ্ব শ্বাসতন্ত্রে এই রোগের জীবাণু থাকে, প্রাণী যদি কোন কারণে পীড়ণের সম্মুখীন হয় যেমন, অধিক গরম, ঠান্ডা, ভ্রমনজনিত দুর্বলতা ইত্যাদি কারণে এই রোগের জীবাণুর বংশবৃদ্ধি ঘটে এবং রোগ দেখা দেয়। গলাফোলা রোগে আক্রান্ত পশুর লালা, মলমূত্র এবং উকুন/আঠালীর মাধ্যমে এই রোগটি ছড়াতে পারে।

লক্ষণ: হঠাৎ করে দেহের তাপমাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি পায় (১০৫°-১০৭° ফা.)। গলার নীচের অংশ ফুলে যায় এবং হাত দিলে গরম অনুভূত হয়। ফোলা ক্রমশ গলা থেকে বুক পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। প্রাণী খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেয়। শ্বাস কষ্ট দেখা দেয়, শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় শব্দ হয়, নাক-মুখ দিয়ে তরল পদার্থ নিঃসরণ হয়। অনেক সময় জিহবা ফুলে যায়, জিহবা বের করে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়। রোগ খুবই তীব্র প্রকৃতির হলে প্রাণী ২৪ ঘন্টার মধ্যে মারা যায়।

চিকিৎসা: লক্ষণ দেখা দেয়ার সাথে সাথে চিকিৎসা করালে ভাল ফল পাওয়া যায়। চিকিৎসার জন্য নিম্নের যে কোন একটি এন্টিবায়োটিক ঔষধ ব্যবহার করা যেতে পারেঃ ওটেট্রো ভেট ইনজেকশন-প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ১০-২০ মিলি মাংসে প্রয়োগ করতে হবে অথবা এসাইপিলিন ইনজেকশন- প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ২-৭ মিলি মাংসে প্রয়োগ করতে হবে অথবা স্ট্রেপটোপেন ইনজেকশন- প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ৫-৭ মিলি মাংসে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিটি ইনজেকশন ২৪ ঘন্টা পরপর ৩-৫ দিন প্রয়োগ করতে হবে। উপরোক্ত যে কোন ঔষধের সাথে হিসটা-ভেট ইনজেকশন ৫-১০ মিলি দিনে ২-৩ বার মাংসে প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

প্রতিকার: রোগের সংক্রমণ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রতিটি প্রাণীকে শীতের শুরুতে গলাফোলা টিকা (H. S. Vaccine) দিতে হবে।

৪. ওলান পাকা রোগ (Mastiitis)

গাভীর ওলানের কোষ-কলায় রোগজীবাণু বিশেষ করে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয়ে প্রদাহের সৃষ্টি হলে তাকে ওলান পাকা রোগ বলে। এ রোগ বিশেষ করে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অস্বাস্থ্যকর উপায়ে ও অপরিস্কার হাতে দুধ দোহন, ওলানের বাটে ক্ষত বা ঘা এ সমস্ত অব্যবস্থাপনার কারণে দেখা দিতে পারে।

ওলান পাকা রোগ (Mastiitis)

লক্ষণ: দুধ পানির মতো সাদা বা দুধ হলদে অথবা ছাগড়া জমা দুধ, ওলান গরম হয় পরে শক্ত হয়ে যায়, ওলানে ফোঁড়া হতে পারে বা পূঁজ জমে এবং জ্বর হয়।

রোগ নির্ণয়: রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ওলানের অবস্থা বাহ্যিকভাবে দেখে এবং

ভালভাবে পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত। দুধের রং, গন্ধ এবং দুধের মধ্যে অস্বাভাবিক পদার্থের উপস্থিতি দেখে রোগ সর্ম্পকে নিশ্চিত হওয়া যায়। জীবাণু কালচার করে সনাক্ত করা যায়।

চিকিৎসা: ওলান পাকা রোগের চিকিৎসার সাফল্য নির্ভর করে আক্রান্তকারী জীবাণুর ধরণ, সংক্রমণের তীব্রতা এবং এর স্থায়ীত্ব ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপর। এন্টিবায়োটিক পেনিসিলিন (৪০ লাখ প্রতিদিন ৫-৭ দিন মাংসে ইনজেকশন) বা অ্যাম্পিসিলিন (২০০০ মিগ্রা ৮ ঘন্টা পর পর ৫ দিন মাংসে ইনজেকশন) বা অ্যামোক্সিসিলিন (১৪০০ মিগ্রা ৮ ঘন্টা পর পর ৫ দিন মাংসে ইনজেকশন)। এন্টিহিস্টামিন (১০ মিলি করে ৩-৫ দিন মাংসে ইনজেকশন) এবং সাধারন স্যালাইন (২-৪ লিটার শিরায় ইনজেকশন)।

নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা:

১. খামারে নতুন গাভীর আগমন হলে সাথে সাথে তার ওলান পরীক্ষাসহ দুধ পরীক্ষা করে ব্যবস্থা নিতে হবে

২. প্রথমে বাচ্চাদানকারী গাভীর দুধ দোহন করে পরবর্তীতে সুস্থ ও ভাল গাভী এবং পরে চিকিৎসা শেষে সদ্য রোগমুক্তিপ্রাপ্ত এবং সর্বশেষ আক্রান্ত গাভীর দুধ দোহন করা।

৫. ইউরিয়া বিষক্রিয়া (Urea poisoning)

ইউরিয়া একটি নাইট্রোজেন যৌগ বা কৃষি সার হিসাবে পরিচিত। রোমন্থক প্রাণীর খাদ্য অতি সামান্য (নির্দিষ্ট) ইউরিয়া মিশিয়ে খুব অল্প খরচে প্রাণীর দেহে প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করা যায়।

ইউরিয়া বিষক্রিয়া (Urea poisoning)

কারণ:

- প্রধানত অনভ্যস্ত প্রাণীর খাদ্যে হঠাৎ করে ইউরিয়া সংযোগ করলে বা খাদ্যে আকস্মিক অতিরিক্ত ইউরিয়া অথবা ত্রুটিপূর্ণ মাত্রায় ইউরিয়া মিশ্রিত হলে প্রাণীর বিষক্রিয়া হয়।
- সাধারণত খড়কে শতকরা ৪ ভাগ ইউরিয়া প্রক্রিয়াজাত করে খাওয়ানো হয়। তবে ইউরিয়া মিশ্রিত খাদ্যে শর্করা যুক্ত হলে প্রাণী অধিক মাত্রায় ইউরিয়া সহ্য করতে পারে। এছাড়া ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক তৈরি করে প্রাণীকে মোটাতাজাকরণে খাওয়ানো যায়।

লক্ষণ:

- গরুকে সাধারণত ইউরিয়া খাওয়ানোর ২০ থেকে ৬০ মিনিটের মধ্যে উপসর্গ প্রকাশ পায়।
- পেটে ব্যাথা, ফেনা যুক্ত লালা ঝরা, মাংসপেশীর কম্পন, দুর্বলতা, শ্বাসকষ্ট, পেটফাঁপা ও হাটতে অসম্মতি ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়।
- এ ধরনের বিষক্রিয়ার কারণে শ্বাসীয় গতিরোধের ফলে গরুতে উপসর্গ প্রকাশের ৪০ মিনিট থেকে ২ ঘন্টার মধ্যে মারা যায়।

রোগ নির্ণয়:

- ইউরিয়া বা ইউরিয়া প্রক্রিয়াজাত খড় খাওয়ানোর ইতিহাস এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপসর্গ দেখে ইউরিয়া বিষক্রিয়া ধরা যায়। এছাড়া পশুর শ্বাস-প্রশ্বাসে অ্যামোনিয়ার গন্ধ থাকবে।
- ক্লিনিক্যালি আক্রান্ত গরুর রক্তে অধিক মাত্রায় অ্যামোনিয়া (০.৭-০.৮ মিগ্রা/ডেসি লিটার) থাকে।

চিকিৎসা:

- এসিটিক এসিড (৫-১০)% অথবা ভিনেগার ০.৫ থেকে ১ লিটার ভেড়া ও ছাগলকে খাওয়াতে হবে। গরুর জন্য ২-৫ লিটার। এই ভিনেগার অ্যামোনিয়াকে নিউট্রালাইজ করে দেয়। চিকিৎসার পর পুনরায় উপসর্গ দেখা দিলে ২০ মিনিট পর পুনরায় ঔষধ খাওয়ানো যায়। বড় ছিদ্রযুক্ত স্টম্যাক টিউব অথবা প্রয়োজনে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে রুমেনের বস্তু বের করে দ্রুত প্রাণীকে মুক্ত করা যায়।

ইউরিয়া মোলাসেস

- মাংসপেশীর কম্পনের জন্য ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামযুক্ত সলুশন প্রায় ২০০-২৫০ মিলি শিরায় ইনজেকশন দেওয়া যায় এবং পানিশূন্যতার জন্য ১-২ লিটার ৫% ডেক্সট্রোজ-স্যালাইন শিরায় প্রয়োগ করা যায়।

জন্মের পর থেকে শুরু করে যেকোন বয়সী বা মাস অনুযায়ী গরু ও মহিষের জন্য টিকা প্রদান করার নির্দেশিকা

বাছুরের বয়স/ মাস অনুযায়ী	টিকা	পরামর্শ
৪৫ দিন	ক্ষুরারোগ	প্রথম টিকা প্রদান
২ মাস	ক্ষুরারোগ	বুস্টার টিকা প্রথম বার দেওয়া থাকলে
৪ মাস (ডিসেম্বর)	ক্ষুরারোগ	আগে না দেওয়া থাকলে প্রতি বছর একই সময় ধরে
৬ মাস (মার্চ)	বাদলা	প্রতি বছরে ১ বার
৬ মাস ২১ দিন (এপ্রিল)	তড়কা	প্রতি বছরে ১ বার
৭ মাস ১৪ দিন (মে)	গলাফুলা	প্রতি বছরে ১ বার
১০ মাস (জুন)	ক্ষুরারোগ	প্রতি ৬ মাস পর পর

বাছুরের রোগঃ

বাছুরের রোগ সাধারণত দুই প্রকার। সাধারণ রোগঃ যে সব রোগব্যাধি আক্রান্ত প্রাণীতে সীমাবদ্ধ থাকে, সহজে অন্য প্রাণীতে সংক্রামিত হয় না এবং তুলনামূলকভাবে প্রাণীর মৃত্যুর হার কম, তাকে সাধারণ রোগ বলে। যদিও সাধারণ রোগে মৃত্যুর হার কম, কিন্তু আক্রান্ত বাছুরের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, দৈহিক শক্তি ও বৃদ্ধি কমে যায় এবং উৎপাদন হ্রাস পায়। এজন্য সাধারণ রোগকে অবহেলা না করে ত্বরিত চিকিৎসা ব্যবস্থা নেয়া দরকার। আমাদের দেশে বাছুরের সচরাচর যে সব সাধারণ রোগ-বালাই দেখা যায় বা হয়, সেগুলোর প্রাথমিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে:

পেট ফাঁপা, বদ হজমঃ

খাদ্যনালীতে কিছু আটকে গেলে অথবা কাদা বালি মিশ্রিত খাদ্য খেলে পেট ফাঁপা বা বদ হজম দেখা দিতে পারে। গ্যাসের জন্য পেট অত্যধিক ফুলে যায় ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। পশু জাবর কাটাও বন্ধ করে দেয় এবং শরীরের তাপ কিছুটা বৃদ্ধি পায় (১০২০-১০৪০)। অসুখ দেখা দেয়ার সাথে সাথে খাদ্য বন্ধ রাখা দরকার এবং এ অবস্থায় পশুকে ঢালু জায়গায় রাখতে হবে যেন তার শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট না হয়। প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে পারগেটিভ বা কারমিনেটিভ মিকচার খাওয়ানোর ব্যবস্থা নিলে ভাল হয়। প্রয়োজনবোধে অভিজ্ঞ ডাক্তারের সহায়তায় পেট ফুটো করে গ্যাস বের করে দেয়া যেতে পারে।

বাছুরের পেট ফাঁপা, বদ হজম

উদরাময়, পাতলা পায়খানা ইত্যাদিঃ

অনেক রোগের কারণে পাতলা পায়খানা হয়ে থাকে, তবে অন্ত্রের রোগ এদের মধ্যে অন্যতম। ঘনঘন পাতলা পায়খানার দরুন বাছুরের মুখ শুকিয়ে যায় এবং দুর্বল হয়ে পড়ে। জীবাণুঘটিত পাতলা পায়খানার কারণে আক্রান্ত বাছুর মারাও যেতে পারে। প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে বাছুরকে সালফার জাতীয় টেবলেট খাওয়ানো যেতে পারে। দুর্বলতার জন্য স্যালাইন বা গ্লুকোজ ইনজেকশন দেয়া যেতে পারে।

বাছুরের উদরাময়, পাতলা পায়খানা

কোষ্ঠকাঠিন্যঃ

বিভিন্ন কারণে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দিতে পারে। কোষ্ঠকাঠিন্য হলে খাদ্যে অরুচি, পেট ফোলাভাব, পেটব্যথা, পায়খানা শক্ত ও পরিমাণে খুব কম ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। কোষ্ঠকাঠিন্যে ক্যাস্টর ওয়েল (ভেরেন্ডার তৈল) বাওয়েল লিলি (তিষির তৈল) ১/২-২ পাউন্ড খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়। তাছাড়া লবণ, পানিসহ

ম্যাগসাল্ফ (Magsulf), পানিসহ ম্যাগকারব (Magcurb) বা অন্যান্য পারগেটিভ মিকচার (Purgative) খাওয়ালে ভাল ফল পাওয়া যায়।

সর্দি-কাশি

অত্যধিক ঠান্ডা, বৃষ্টিতে ভেজা, প্রখর রৌদ্রে থাকা, অবহাওয়ার পরিবর্তনহেতু সর্দি-কাশি হতে পারে। তাছাড়া রোগজীবাণুতে আক্রান্ত হলেও সর্দি-কাশি হতে পারে। নাক দিয়ে পানি পড়া, মাঝে মাঝে হাঁচি বা কাশি দেয়া প্রাথমিক লক্ষণ, তবে এর সাথে শরীর ব্যথা ও জ্বর হতে পারে। সর্দি-কাশি দেখা দিলে আক্রান্ত বাছুরটিকে শুকনো আলো-বাতাস পূর্ণ ঘরে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা নেয়া দরকার। সালফার জাতীয় ট্যাবলেট, সালফাডায়াজিন (Sulphadiazin), ভেসাডিস (Vesadin), ট্রিনামাইড (Trinamide), ইত্যাদি খাওয়ালে উপকার পাওয়া যায়। কুসুম গরম সরিষার তৈল, ক্যাম্ফর বা তারপিন লিনিমেন্ট দুই পাঁজরে মালিশ করা যেত পারে।

কৃমি

কৃমি আক্রান্ত বাছুর

জন্মের পরপরই এমনকি জন্মের আগেও বাছুর মাতৃ গর্ভে কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। যে সব কৃমি দ্বারা বাছুর আক্রান্ত হয় তার মধ্যে লম্বা, গোল, কেঁচো বা সুতা কৃমি (Roundworm), চেপ্টা বা পাতা কৃমি (Fluke), ফিতা কৃমি (Tapeworm) উল্লেখযোগ্য। এগুলো আবার বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। বিভিন্ন প্রকারের কৃমি প্রাণীর পাকস্থলী ও অন্ত্রনালীতে বাস করে, আবার কোনো কোনো কৃমি কলিজা ও ফুসফুসকে আক্রান্ত করে। কৃমি আক্রান্ত প্রাণী মাঠে বা চারণভূমিতে পায়খানা করার ফলে মাঠের ঘাস দুষিত হয়। এসব দুষিত ঘাস সুস্থ গরু খেলে তারাও কৃমিতে আক্রান্ত হয়। তাছাড়া অনেক কৃমি আছে যা শরীরের চর্ম ভেদ করে দেহে প্রবেশ করে। কৃমিতে আক্রান্ত বাছুর সহজে মারা না গেলেও স্বাস্থ্য খারাপ হতে থাকে এবং দৈহিক বৃদ্ধি হ্রাস পায়। আক্রান্ত বাছুরকে ঠিকমত খাবার দিলেও তার স্বাস্থ্যেও কোনো উন্নতি হয় না। বরং দিনদিন রোগা হতে থাকে। কারণ কৃমি পশুর খাবারের সারাংশে ভাগ বসায় এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গেও ক্ষতি সাধন করে। আক্রান্ত বাছুরের শরীরের লোম উসকোখুসকো দেখায়, বাছুর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং দৈহিক বৃদ্ধি ও খাওয়া-দাওয়া কমে যায়। প্রাণী ক্রমান্বয়ে হাড্ডিসার হয়ে পড়ে এবং রক্ত শূন্যতা দেখা দেয়। কখনো পাতলা পায়খানা আবার কখনো কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়। আক্রান্ত বাছুরের শরীরে বিশেষত চোয়ালের নিচে পানি জমতে থাকে। গোল কৃমির জন্য নেমাফেক্স (Nemafex) , ট্রোডেক্স (Trodex), রালনেক্স (Ralnex), নেলভার্ম (Nelverm), পাতাকৃমির জন্য বিলিভন (Bilivon), ফেসিনেক্স (Fesinex), জেনিল (Zenil), ফিতাকৃমির জন্য প্রিপিসাইড (Pripicide), ইউভিলন (Uvilon), ম্যানসলিন (Mansolin) ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। আমাদের দেশে গবাদি পশুর লালন-পালন ব্যবস্থায় বছরে ২ বা ক্রিমির ঔষধ খাওয়ানো ভাল।

বাছুরের সাদা উদরাময় (Calfscour/colibacillosis)

সাধারণত ২ সপ্তাহের নিচের বয়সের বাছুরে এ রোগ দেখা যায়। কাফস্কাওয়ার হলে বাছুর পাতলা সাদা পায়খানা করে, এটি বাছুরের একটি মারাত্মক ব্যাধি। খারাপ ব্যবস্থাপনা ও কৃত্রিম উপায়ে বাছুরকে ঠিকমত না খাওয়ানোর কারণে এ রোগ হতে পারে। তাছাড়া শালদুধের অভাব, একসময়ে বা অনিয়মিতভাবে অত্যধিক পরিমাণে দুধ খাওয়ানো, অথবা অত্যধিক ঠান্ডা দুধ খাওয়ানো এবং বাছুরের মায়ের রসদে সবুজ খাদ্য স্বল্পতার কারণে এ অবস্থা হতে পারে। এ রোগের কারণ এসকারেসিয়া কলাই (E. coli) নামক জীবাণু যা সাধারণত মানুষ অথবা পশুর অন্ত্রে বাস করে।

গাভী ও বাছুরের বিভিন্ন ধরণের মেটাবলিক বা বিপাকীয় রোগসমূহ ও উহার প্রতিকার

গাভী বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাণিসম্পদ। গাভী লালন-পালন করে লাভবান হতে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় রোগ ব্যাধি প্রতিকার তাদের মধ্যে অন্যতম। দেহে (রক্তে) বিভিন্ন খনিজ পদার্থ ও অন্যান্য পুষ্টির বিপাকীয় গোলযোগের কারণে এসব রোগ হয়। তাই এ রোগের বিপাকীয় বা মেটাবলিক রোগ বলা হয়, যেমন- দুগ্ধ জ্বর, কিটোসিস ইত্যাদি। সাধারণত গর্ভাবস্থার শেষ পর্যায়ে, প্রসবকালীন এবং সর্বোচ্চ দুধ উৎপাদনকারী সময়ে গবাদিপশু মেটাবলিক রোগে আক্রান্ত হয়। মেটাবলিক (বিপাকীয়) রোগসমূহ সাধারণত দুধাল গাভীর বেশি হয়ে থাকে। তাই প্রসঙ্গতঃ নিম্নে গাভীর বিপাকীয় রোগসমূহ এবং এর প্রতিকার সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো।

দুধাল গাভীর মেটাবলিক (বিপাকীয়) রোগসমূহ ও প্রতিকার

(১) মিল্ক ফিভার / দুধজ্বর (Milk fever)

মিল্ক ফিভার দুগ্ধ জ্বর প্রাপ্ত বয়স্ক গাভীর প্রসবের সাথে সম্পর্কিত একটি বিপাকীয় জ্বর (afebrile) রোগ। প্রসবের সাথে সম্পর্কিত বলে এ রোগকে পারচুরিয়েন্ট পেরেসিস (Parturient paresis) বলা হয়। হাইপোক্যালসেমিয়া, আংশিক পক্ষাঘাত, সাধারণ পেশীর দুর্বলতা, সংবহনে অকৃতকার্যতা (circulatory failure) ও চেতনা হ্রাস (depression of consciousness) এ রোগের বৈশিষ্ট্য।

(১) মিল্ক ফিবার / দুধজ্বর (Milk fever)

কারণতত্ত্ব ও প্যাথজেনেসিস

বাচ্চা প্রসবের আগে বা পরে দেহে ক্যালসিয়ামের অভাব। প্রধানত রক্তে আয়নাইজড ক্যালসিয়ামের পরিমাণ কমে যাওয়ার ফলে দুগ্ধ জ্বর হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় গাভীর রক্তে শতকরা ৯-১২ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে। বাচ্চা প্রসব তথা ওলানে দুধ সৃষ্টির সাথে প্রাণীর রক্তে এই ক্যালসিয়ামের স্বাভাবিক পরিমাণ কমে আসে। সাধারণত রক্তে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ যখন শতকরা ৫ মিলিগ্রামের নিচে নেমে আসে তখন এ রোগ প্রকাশ পায়।

গবেষণায় দেখা গেছে যে, গাভীর পাকাস্ত্র থেকে পর্যাপ্ত ক্যালসিয়াম শোষিত হয়ে রক্তে যায় এবং প্রয়োজনে রক্তের অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম অস্থিতে জমা হয়। অপরদিকে প্রয়োজনে অস্থির ক্যালসিয়াম রক্তে চলে যায় এবং দেহের অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম মল, মূত্র, দুধ ও অন্যান্য নিঃসরণের মাধ্যমে সমতা রক্ষা করে। দুগ্ধ জ্বরের প্রাদুর্ভাবের হার ৫- ১০%।

লক্ষণ:

প্রথম পর্যায়:

- ক্ষুধামন্দা হয়
- অনুভূতিহীন ও নিদ্রালুভাব
- দেহে জ্বর থাকে না ও দেহের প্রান্ত ঠান্ডা থাকে
- অক্ষিতারা প্রসারিত থাকে

দ্বিতীয় পর্যায়:

- মাথা ও পা কাঁপতে থাকে
- উত্তেজিত ভাব দেখা দেয়
- অতি অনুভূতিশীল ও খিচুনি হয়
- দাঁতের শব্দ (grinding) হয়
- হাঁটতে গেলে টলমল করে

তৃতীয় পর্যায়:

- প্রাণী অবসাদগ্রস্থভাবে দেহের এক পাশে মাথা গুঁজে শুয়ে থাকে। এই বিশেষ ভঙ্গি দুগ্ধ জ্বরের বিশেষ বৈশিষ্ট্য
- দেহের তাপমাত্রা হ্রাস পায়
- প্রস্রাব ও মল ত্যাগ হয় না
- অস্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃৎপিন্ডের গভীরতা হ্রাস
- চিকিৎসাবিহীন অবস্থায় ১২-২৪ ঘন্টার মধ্যে মৃত্যু ঘটে
- রুমেনের টিম্প্যানি বা রুমেনের বস্তু শ্বাসনালীতে প্রবেশ বা খিঁচুনিজনিত কারণে মৃত্যু ঘটে।

চিকিৎসা:

দুগ্ধ জ্বরের সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা ক্যালসিয়াম বোরোগ্লুকেনেট সলুশন (৪০০ মিলি ৪০% সলুশন)। আজকাল বাজারে বিভিন্ন কোম্পানির তৈরি ক্যালসিয়াম সলুশন পাওয়া যায়।

(ক) সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা (Specific treatment):

- দুগ্ধ জ্বরের মূল কারণ রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা হ্রাস। তাই যত দ্রুত সম্ভব ক্যালসিয়াম বোরোগ্লুকেনেট সলুশন ইনজেকশন দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে।
- সাধারণ ক্যালসিয়াম সলুশন ইনজেকশন দেয়ার সাথে সাথেই শতকরা ৬০ ভাগ এবং ২ ঘন্টার মধ্যে ১৫ ভাগ গাভী আরোগ্য লাভ করে। তবে শতকরা ১০% গাভী অন্য রোগের জটিলতাসহ আরোগ্যলাভ করলেও ১৫% গাভী মারা যায় বা ছাঁটাই করতে হয়।

প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ:

১. প্রধানত দুটি নীতি অনুসরণ করে গাভীর দুগ্ধ জ্বর প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যথা- (১) খাদ্য সংশোধন (correction of diet) এবং

২. প্রি-ডিসপোজিং ফ্যাক্টরস সংশোধন (correction of predisposing factors)

খাদ্য সংশোধন (correction of diet):

(ক) গাভীর শুষ্ক অবস্থায় ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাদ্য সরবরাহ।

- গাভীর শুষ্ক অবস্থায় ক্যালসিয়াম সরবরাহ পরিহার করতে হবে। কারণ খাদ্যে উচ্চ মাত্রায় ক্যালসিয়াম থাকলে নিম্নোক্ত সমস্যা দেখা দেয়।
- দেহকে সম্পূর্ণ পাকাস্ত্রেও ক্যালসিয়াম শোষণের উপর নির্ভরশীল করে তুলে। এতে অস্থি ও ক্যালসিয়াম মবিলাইজেশন প্রায় নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। বাচ্চা প্রসব ও কলস্ট্রামের প্রচুর ক্যালসিয়াম প্রয়োজনে অস্থি থেকে দ্রুত ক্যালসিয়াম মবিলাইজড হতে পারেনা।

(খ) খাদ্যে অতিরিক্ত ফসফেট সরবরাহ।

(গ) খাদ্যে ম্যাগনেসিয়াম কম থাকলে অস্থির ক্যালসিয়াম মবিলাইজেশন হ্রাস পায়, ফলে দুগ্ধ জ্বর দেখা দেয়, তাই গাভীকে প্রতিদিন ৬০ গ্রাম হিসেবে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড খাওয়ালে এ রোগ প্রতিরোধ হয়।

(ঘ) বাচ্চা প্রসবের ৪৫ দিন পূর্ব থেকে অ্যালকালাইন সৃষ্টিকারী খাদ্যের পরিবর্তে মিনারেল সমৃদ্ধ (ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম) খাদ্য খাওয়ানো প্রয়োজন।

প্রি ডিসপোজিং ফ্যাক্টরস সংশোধন (clrrection of pre-disposing factors)

(ক) বয়স্ক গাভীর বিশেষ যত্নের প্রয়োজন যাতে এ রোগ না হয়।

(খ) জাত (Breed) -জার্সি জাতের গাভীর এরোগ প্রতিরোধের জন্য বিশেষ যত্ন ও ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন।

(গ) গাভীর শুষ্ক, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর সুষম পুষ্টির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

(ঘ) সুষ্ঠু পালন ব্যবস্থা (husbandry)

- গাভীর শুষ্ক অবস্থায় যাতে দেহ অতিরিক্ত মেদবহুল না হয় তার ব্যবস্থা করা। তবে সর্বদাই রুচিকর খাদ্য সরবরাহ করা প্রয়োজন।
- বাচ্চা প্রসবকালীন যাতে স্ট্রেস না পড়ে তার ব্যবস্থা করা। এছাড়া বাচ্চা প্রসবের ৪৮ ঘন্টা পূর্বে ও পরে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- বাচ্চা প্রসবের সাথে অনেকে এ রোগ প্রতিরোধের জন্য ক্যালসিয়াম ইনজেকশন দেয় কিন্তু ইহা বাস্তবসম্মত নয়।

(২) কিটোসিস

কিটোসিস দুগ্ধবতী রোমন্থক প্রাণীর কার্বোহাইড্রেট ও ভোলাটাইল ফ্যাট অ্যাসিডের ত্রুটিপূর্ণ মেটাবলিজমের কারণে সৃষ্ট একটি বিপাকীয় রোগ। কিটোনেমিয়া, কিটোনিউরিয়া, হাইপোগ্লাইসেমিয়া ও যকৃতে গ্লাইকোজেনের স্বল্পতা এ রোগের বায়োকেমিক্যাল বৈশিষ্ট্য। ডেইরি গাভীর এ রোগকে কিটোসিস এবং ভেড়ীর গর্ভাবস্থায় শেষ পর্যায়ে প্রেগন্যান্সি টকসেমিয়া

বলা হয়। এ রোগে আক্রান্ত গাভীর রক্তে অ্যাসিটোনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। তাই এ রোগকে অ্যাসিটোনেমিয়াও বলা হয়। স্নায়বিক উপসর্গ, ক্ষুধামন্দা, দৈহিক ওজন ও দুধ উৎপাদন হ্রাস এ রোগের প্রধান ক্লিনিক্যাল বৈশিষ্ট্য।

লক্ষণ

ক্লিনিক্যাল ও সাব-ক্লিনিক্যাল উভয় প্রকৃতির কিটোসিস রোগ হয়। গাভীর ক্লিনিক্যাল কিটোসিস রোগে প্রধানত নিম্নোক্ত দুই প্রকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ক্ষীয়মান প্রকৃতি

- ক্রমশ মাঝারি ক্ষুধামান্দ্য এবং ২-৪ দিন থেকে দুধ দেয়া হ্রাস পায়।
- আক্রান্ত গাভী প্রথমে শস্যদানা জাতীয় ও পরে সাইলেজ খাওয়া বন্ধ করে। তবে খড় খেতে থাকে।
- খাদ্য গ্রহণে অনীহা প্রকাশ পায়, স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে এবং দেহে অবসাদভাব দেখা দেয়।
- চোখ প্রথম দিকে উজ্জ্বল থাকলেও পরে তা অনুজ্জ্বল ও নিস্প্রভ হয়ে যায়।
- ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা থাকেনা এবং চাকচিক্য নষ্ট হয়ে যায়।
- দেহের তাপ , নাড়ী ও শ্বাস-প্রশ্বাস প্রায় স্বাভাবিক থাকে। তবে সামান্য কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা যায়।
- আক্রান্ত গাভীর শ্বাস- প্রশ্বাস, প্রস্রাবে, দুধে এমনকি গোয়াল ঘরের সমস্ত আবহাওয়ায় মিষ্টি অ্যালকোহলিক গন্ধ পাওয়া যায়।
- কতিপয় ক্ষীয়মান প্রকৃতির রোগের ক্ষেত্রে স্নায়বিক উপসর্গ থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে দাঁড়াতে টলায়মান অবস্থা ও সাময়িক অন্ধত্ব দেখা দেয়।

স্নায়বিক প্রকৃতি

- লালাঝরা, অস্বাভাবিক চর্বণ, অহেতুক সবকিছু চাটা, ইত্যাদি উপসর্গ পরিলক্ষিত হয়।
- বিশেষ করে কাঁধ ও মধ্য ফ্লাঙ্কের মাংসপেশীর কাঁপুনি দেখা দেয় এবং গাভী টলমল করে, দাঁড়াতে পারেনা।
- উদ্দেশ্যহীনভাবে চলাচল করে, ত্বক ও বিভিন্ন বস্তু চাটে। স্পষ্ট অন্ধত্ব দেখা দেয়।
- স্নায়বিক অতিবেদন, কাঁপুনি ও খিঁচুনি থাকে। চিকিৎসা না হলে পশু মারা যেতে পারে।

চিকিৎসা

রিপেসমেন্ট থেরাপি:

- গ্লুকোজ বা ডেক্সট্রোজ ৫০% নরমাল স্যালাইনে সলুশন বানিয়ে ৫০০ মিলিলিটার শিরায় ইনজেকশন করলে দ্রুত সুফল পাওয়া যায়। তবে এই গ্লুকোজর কার্যকারিতা ক্ষণস্থায়ী; প্রায় ২ ঘন্টার মত। তাই পুন: পুন: গ্লুকোজ ইনজেকশন দেয়ার প্রয়োজন হয়। এই ভাবে গ্লুকোজ ইনজেকশন দেয়ার পরিবর্তে গ্লুকোজ সৃষ্টিকারী প্রোপাইলিন গ্লাইকোল বা গ্লিসারিন ১২৫ থেকে ২৫০ গ্রাম সমপরিমাণ পানির সাথে মিশিয়ে দিনে দুই বার করে প্রথম দুদিন এবং অর্ধেক মাত্রা দিনে একবার করে দুদিন খাওয়ালে পুনরায় গ্লুকোজ ইনজেকশন দেয়ার প্রয়োজন হয়না।
- কোবাল্টের অভাব হলে প্রোপাইলিন গ্লাইকোলের সাথে প্রতিদিন ১০০ মিলিগ্রাম কোবাল্ট খাওয়াতে হবে।

হরমোন্যাল থেরাপি

(ক) গ্লুকোকর্টিকয়েডস

- গ্লুকোকর্টিকয়েডস হরমোন গ্লুকোজের সাথে বা প্রোপাইলিন গ্লাইকোলের সাথে অথবা একক ভাবেও এ রোগের চিকিৎসায় চমৎকার কাজ করে। অধিকাংশ বাণিজ্যিক গ্লুকোকর্টিকয়েডস কার্যকরভাবে চিকিৎসায় ব্যাবহার করা যায়। মাত্রা ও কার্যকারিতার দিক থেকে ১০০০ মিলিগ্রাম হাইড্রোকর্টিসেন = ১০০ মিলিগ্রাম প্রেডনিসোলোন = ১০ মিলিগ্রাম ডেক্সামেথাসোন = ২ মিলিগ্রাম বেটামিথাসোন = ২ মিলিগ্রাম ফ্লুমেথাসোন মাংসপেশীতে ইনজেকশন করতে হয়।
- প্রেডনিসোলোন + ডেক্সামেথাসোন সমন্বয়ে ঔষধ গাভীকে ৪-৮ মিলিলিটার মাংসপেশীতে ইনজেকশন দিতে হয়। অতিরিক্ত মাত্রায় গ্লুকোকর্টিকয়েডস ইনজেকশন ক্ষুধমন্দা সৃষ্টি করে সাথে দুধ উৎপাদনও কমে যায়।

(খ) অ্যানাবলিক স্টেরয়েডস ৬০ থেকে ১২০ মিলিগ্রাম আক্রান্ত প্রাণীর মাংসপেশীতে একটি ইনজেকশন কিটোসিস রোগের চিকিৎসা বেশ কার্যকর। এ ঔষধ প্রাণীর ক্ষুধা ও গ্লুকোজেনিক প্রিকারসর সরবরাহ বৃদ্ধি করে।

প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ

জটিল প্রক্রিয়ার নানাবিধ কারণে কিটোসিস রোগ হয়। তাই রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণেও বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। তবে দুগ্ধবতী গাভীর খাদ্য ও পালন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিম্নোক্তভাবে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

১. পালন ও খাদ্য সংশোধন (Husbandry correction of ration)

- গাভীর বাচ্চা প্রসবের পর দুদিনের প্রথম অবস্থা পর্যন্ত কার্বোহাইড্রেটযুক্ত খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।
- বাচ্চা প্রসবকালীন সময় গাভী যাতে অনাহারে না থাকে আবার মেদবহুল না হয় সে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।
- ভুট্টা ভূষিতে পর্যাপ্ত আলফা পলিমারেজড গ্লুকোজ থাকে যা রুমেনে ফারমেন্টেড না হয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রে শোষিত হয়। তাই ভুট্টা ভূষি এ রোগ প্রতিরোধের জন্য গাভীকে খাওয়ানো যায়।
- বেঁধে পালা গাভীকে প্রতিদিন কিছু হাঁটাহাঁটির ব্যবস্থা করতে হবে।
- দুগ্ধবতী গাভীর খাদ্য তালিকায় পর্যাপ্ত কোবাল্ট, ফসফরাস ও আয়োডিন থাকা প্রয়োজন।
- গাভীকে অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেটযুক্ত খাদ্য সরবরাহ করে রুমিন্যাল অ্যাসিডেসিস এবং অতিরিক্ত প্রোটিনযুক্ত খাদ্য সরবরাহ করে অ্যাসিটোনেমিয়া যাতে না হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে।

২. প্রতিষেধক খাদ্য (Prophylactic feeding)

- কিটোসিস রোগের সম্ভাবনা রয়েছে এমন গাভীর পালে -সোডিয়াম প্রোপিওনেট গাভীর বাচ্চা প্রসবের পর থেকে প্রত্যহ ১১০ গ্রাম ৬ সপ্তাহ খাওয়ালে একদিকে এরোগ প্রতিরোধ হয় অন্যদিকে গাভীর দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।
- প্রোপাইলন গ্লাইকোল (Propylene glycol) প্রত্যহ ৩৫০ মিলিলিটার করে গাভীর বাচ্চা প্রসবের পর থেকে ১০ দিন অথবা দানাদার খাদ্যে শতকরা ৬ ভাগ মিশিয়ে ৮ সপ্তাহ খাওয়ালে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

৩. সাব-ক্লিনিক্যাল রোগ প্রতিরোধ (Propylene glycol)

- গাভীর বাচ্চা প্রসবের পর ২-৬ সপ্তাহের মধ্যে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ নির্ণয় করে (<৩৫ mg/dl) এ রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।
- গাভীর বাচ্চা প্রসবের পর দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রস্রাবে কিটোন বডিজ নির্ণয় করেও প্রাথমিক অবস্থায় এ রোগ সনাক্ত করা যায়।

৪. হাইপোম্যাগনেসেমিক টিট্যানি/ গ্রাস টিট্যানি/ ল্যাকটেশন টিট্যানি

হাইপোম্যাগনেসেমিক টিট্যানি বিভন্ন শ্রেণীর রোমন্থক প্রাণীর ম্যাগনেসিয়ামের ঘাটতিজনিত একটি অত্যন্ত মারাত্মক রোগ। হাইপোম্যাগনেসেমিয়া অথবা হাইপোক্যালসেমিয়া সহযোগে হাইপোম্যাগনেসিমিয়া এ রোগের প্রধান বায়োকেমিক্যাল বৈশিষ্ট্য।

লক্ষণ :

তীব্রতা অনুযায়ী এ রোগে নিম্নোক্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

(ক) তীব্র প্রকৃতি :

* প্রাণী হঠাৎ খাওয়া বন্ধ করে দেয়। অস্বাভাবিক সতর্কতা পরিলক্ষিত হয় এবং প্রাণী অস্বস্তিবোধ করে।
* তীব্র অতিবেদনের কারণে সামান্য উত্তেজনায় যন্ত্রণায় চিৎকার করে। এছাড়া অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে লাফালাফি করতে দেখা যায়।
* টলমল চলনভঙ্গি। হাঁটতে গেলে হোঁচট খায়। শেষে মাটিতে পড়ে যায় এবং টিটানি ও খিঁচুনি দেখা দেয়।
* খিঁচুনির সময় অপিসথোটোনাস, ট্যারাত্ব দেখা দেয়। মুখ চপ চপ করে ও মুখে ফেনা হয়।
* মাংসপেশীর খিঁচুনির ফলে দেহের তাপ বৃদ্ধি পায়। নাড়ীর গতি ও শ্বাস- প্রশ্বাস বেড়ে যায়।
* নার্ভাস ডায়রিয়া দেখা দেয়। ঘন ঘন প্রস্রাব হয়। এরূপ চিকিৎসাবিহীন প্রাণী আধঘান্টা থেকে এক ঘন্টার মধ্যে মারা যায়।

(খ) মৃদু প্রকৃতি:

* কিছুটা ধীর গতিতে ৩-৪ দিনে উপসর্গ প্রকাশ পায়। ক্ষুধা হ্রাস পায়। দুধ দেয়া কমে যায়। রুমিন্যাল গতি হ্রাস পায়।
* অনৈচ্ছিক মল মূত্র ত্যাগ হতে দেখা যায়। মাংসপেশীর কাঁপুনি ও পিছনের পায়ের মৃদু টেটানি হয়।

* যে কোন গোলযোগে (যেমন হঠাৎ চলন বা গতি, শব্দ, ত্বকে নিডিল বিধালে ইত্যাদি) তীব্র খিঁচুনি হয়।
* আক্রান্ত প্রাণী কয়েক দিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ করে অথবা ক্রমঅবনতিতে প্রাণী শুয়ে পড়ে।

(গ) দীর্ঘমেয়াদী প্রকৃতিঃ

* আক্রান্ত পালের অনেক প্রাণীর রক্তে ম্যাগনেসিয়াম কম থাকে তবে তেমন কোন উপসর্গ দেখা দেয় না।
* কতিপয় আক্রান্ত প্রাণীর অবসাদভাব, পরিবর্তিত ক্ষুধা ও ক্রমশ শুকিয়ে যাওয়া পরিলক্ষিত হয়।

চিকিৎসা

রোগাক্রান্ত প্রাণীর রক্তের বায়োকেমিক্যাল পরীক্ষা ও চিকিৎসায় ফলোদয়ের উপর ভিত্তি করে চিকিৎসা প্রায়োগ করলে অধিক সুফল পাওয়া যায়।

- ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম সলুশন ইনজেকশন প্রতিটি আক্রান্ত গরুকে ৫০০ মিলিলিটার ক্যালসিয়াম বোরোগ্লুকোনেট ২৫% এবং ৫% ম্যাগনেসিয়াম হাইপোফসফেটের সমন্বয়ে অর্ধেক ত্বকের নিচে ইনজেকশন দিয়ে চিকিৎসা করতে হয়।
- ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের সমন্বয়ে ইনজেকশন দেয়ার পর ২০% ম্যাগনোসিয়াম সালফেট সলুশন ২০০-৩০০ মিলিলিটার পরিমাণ শিরা ও ত্বকের নিচে ইনজেকশন দেয়া যায়।

৫. ডাউনার কাউ সিনড্রোম (Downer cow syndrome)

যেসব গাভী ২৪ ঘন্টার অধিক সময় ধরে মাটিতে শুয়ে থাকে বা মেঝেতে পড়ে গিয়ে (sterna recumbency) স্বেচ্ছায় আর উঠে দাঁড়াতে পারে না এরূপ অবস্থাকে ডাউনার কাউ সিনড্রোম বলা হয়। এ রোগে নিম্নোক্ত সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকে।

- গাভী ২৪ ঘন্টারও অধিক সময় মেঝেতে পড়ে থাকে, উঠতে পারেনা।
- প্রধানত দুগ্ধ জ্বরের কারণেই এ রোগ হয় এবং পরপর দুটি ক্যালসিয়াম ইনজেকশন দেয়ার পরও গাভী স্বেচ্ছায় উঠে দাঁড়াতে পারেনা।
- কোন সুনির্দিষ্ট কারণ সনাক্ত করা যায় না।
- গাভীর বুকের উপর ভর করে মেঝেতে পড়ে থাকে (sterna recunbency)
- এটি রোগের যে কোন অবস্থায় হতে পারে তবে প্রসবের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

ডাউনার কাউ সিনড্রোম (Downer cow syndrome)

কারণতত্ত্ব

এ রোগের কারণ সুনিদিষ্টভাবে জানা যায় না। তবে দুগ্ধ জ্বর রোগে জটিলতা হয়েছে। বাচ্চা প্রসবের সময় প্রধানত নিমোক্ত কারণে গাভীর এ অবস্থা হয়।

- মেটাবলিক গোলযোগ (Metabolic disorders) হাইপোক্যালসেমিয়া, হাইপোকম্যনেশেমিয়া, হাইপোফসফেটেমিয়া, কিটোসিস, ফ্যাট কাউ সিনড্রোম, ব্লোট, হাইপোথমিয়া ইত্যাদি।
- টকসেমিয়া (Toxaemia) অতি তীব্র ম্যাস্টাইটিস,তীব্র সেপ্টিক মেট্রাইটিস, একিউট পেরিটোনাইটিস, অ্যাম্পিরেশন নিউমোনিয়া, ট্রম্যাটিক রেটিকুলো পেরিটোনাইটিস ইত্যাদি।
- প্রসবকালীন দুর্ঘটনা জরায়ু বিদীর্ণ,অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ, অবটিউরেটর প্যারালাইসিস, পেলভিস অস্থিভঙ্গ, স্যাকরালের স্থানচ্যুতি, সিয়াটিক স্নায়ুর পক্ষাঘাত অতি ক্লান্তি ইত্যাদি।
- প্রসবোত্তর দুর্ঘটনা পেলভিস অস্থিভঙ্গ, ফিমার অস্থিভঙ্গ, রাউন্ড লিগামেন্ট বিদীর্ণ, হিপের স্থানচ্যুতি, গ্যাস্টেসিনেমিয়াস পেশী ও টেনডোন বিদীর্ণ, পেরিফেরাল স্নায়ু (টিবিয়াল) নষ্ট ইত্যাদি।

প্রতিরোধঃ

ডাউনার কাউ সিনড্রোম রোগের কোন সুনির্দিষ্ট কারণ জানা যায়নি। তাই যে সব ঝুঁকিপূর্ণ ফ্যাক্টরের কারণে গাভীর এ রোগ হয় সে সব ফ্যাক্টরসমূহ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নিয়ে এ রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

- মেটাবলিক গোলযোগ প্রতিরোধ (prevention of metabolic disorders): গাভীকে সুষম খাদ্য দিতে হবে। প্রাথমিক অবস্থায় সঠিক রোগ নির্ণয় ও সুষ্ঠ চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে হবে। বাচ্চা প্রসবের পর থেকে গাভীকে বিশেষ পর্যবেক্ষণ ও পরিচর্যা করতে হবে।
- টকসোমিয়া প্রতিরোধ (prevention of toxaemia): স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাপনায় পালন করা ও রোগের প্রাথমিক অবস্থায় রোগ নির্ণয় ও সুষ্ঠভাবে চিকিৎসা করা প্রয়োজন।
- আঘাত প্রতিরোধ (prevention of injury): বাচ্চা প্রসবের সময় গাভীর আরামদায়ক বিছানার ব্যবস্থা করতে হবে। গাভী যাতে কোনভাবে পিছলে না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- পালন ব্যবস্থা (roper husbandry): গাভীর শুষ্ক অবস্থায় যেন পুষ্টির অভাব না হয় বা অতিরিক্ত মেদ বহুল না হয়ে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৪. প্রসবোত্তর হিমোগ্লোবিনিউরিয়া/পোস্ট-পাচুরিয়েন্ট হিমোগ্লোবিনিউরিয়া (Post-parturient haemoglobinuria)

অধিক দুধ উৎপাদশীল গাভীর বাচ্চা প্রসবের পরে এ রোগ হয়। তাই এ রোগকে প্রসবোত্তর হিমোগ্লোবিনিউরিয়াও বলা হয়। ইন্ট্রাভাসকুলার হেমোলাইসিস, হিমোগ্লোবিনিউরিয়া ও অ্যানেমিয়া ও রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

লক্ষণঃ

- তীব্র প্রকৃতির রোগে দুর্বলতা, দুধ কমে যাওয়াসহ গাঢ় লাল থেকে কালো রংয়ের প্রস্রাব ত্যাগ করতে দেখা যায়।
- ক্ষুধামন্দা, ডিহাইড্রেশন ও দেহের ওজন হ্রাস পেতে দেখা যায়। দেহের তাপ কিছুটা বৃদ্ধি পায়। নাড়ীর স্পন্দন ও শ্বাস প্রশ্বাস বেড়ে যায়। সাধারণত মল শুষ্ক ও শক্ত হয়।
- অক্ষিপর্দা অ্যানেমিয়ার জন্য ফ্যাকাশে দেখায়। তীব্র প্রকৃতির রোগে ৩-৫ দিনের মধ্যে গাভী দুর্বল টলমল অবস্থায় শুয়ে পড়ে এবং শেষে মৃত্যু বরণ করে।
- এ রোগের দীর্ঘমেয়াদী কেসে জন্ডিস হয়। এছাড়া রোগ থেকে বেঁচে ওঠা পশুর দেহে ফসফরাসের অভাবজনিত কারণে বিকৃত ক্ষুধা পরিলক্ষিত হয়। অনেক সময় এ রোগের সাথে কিটোসিস রোগও হতে পারে।

চিকিৎসাঃ

- প্রায় ৪৫০ কেজি দৈহিক ওজনের আক্রান্ত গাভীর শিরায় ৫ লিটার বাড ট্রান্সফিউশন করলে প্রায় ৪৮ ঘণ্টায় গাভী বিপদমুক্ত হয়।
- সোডিয়াম এসিড ফসফেট ৪৫০ কেজি দৈহিক ওজনের গাভীর জন্য ৬০ গ্রাম ৩০০ মিলি পরিস্রুত পানিতে মিশিয়ে শিরায় ও ত্বকের নিচে ইনজেকশন দিতে হয়। একই মাত্রায় ১২ ঘণ্টা পরপর ৩টি ইনজেকশন দিতে হয়।

প্রতিরোধঃ

বাচ্চা প্রসবের পর থেকে গাভীকে তার দৈহিক প্রয়োজন ও দুধ উৎপাদনের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে খাদ্যে পর্যাপ্ত ফসফরাস সরবরাহের মাধ্যমে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়। এ ক্ষেত্রে বেশি দুধদানকারী গাভীর খাদ্যে প্রত্যহ ৩০ গ্রাম হিসেবে সোডিয়াম অ্যাসিড ফসফেট অথবা ১০০ গ্রাম হিসেবে বোন মিল সরবরাহ করা প্রয়োজন।

- মাটিতে কপারের অভাব এমন এলাকায় ঘাসের উপর কপার সলুশন স্প্রে করে অথবা ১২০ মিলিগ্রাম কপার সলুশন বাচ্চা প্রসবের পূর্বের মাসে ত্বকের নিচে ইনজেকশন দিয়ে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।
- বাচ্চা প্রসবের পর গাভীর প্রতি দিনের খাদ্যে ১৫ কেজির নিচে ক্রুসিফেরাস উদ্ভিদ জাতীয় ঘাস থাকা প্রয়োজন।

হাইপোম্যাগনেশেমিক টেটানিজ (Hypomagnesemic tetanies)

(সমনাম-ল্যাকটেশন টিটানি, গ্রাস টেটানি, গ্রাস স্ট্যাগারস, হুইট পাসচার পয়জনিং)

হাইপোম্যাগনেশেমিক টিটানি বিভিন্ন শ্রেনীর রোমন্থক প্রাণীর ম্যাগনেশিয়ামের ঘাটতিজনিত একটি অত্যন্ত মারাত্নক রোগ। হাইপোম্যাগনেশেমিয়া এবং অথবা হাইপোক্যালশেমিয়া সহযোগে হাইপোম্যাগনেশেমিয়া এ রোগের প্রধান বায়োকেমিক্যাল বৈশিষ্ট্য। টনিক ক্লোনিক পেশীর স্পাজম ও খিঁচুনি এবং শ্বাসকার্যে ব্যর্থতায় মৃত্যু এ রোগের প্রধান ক্লিনিক্যাল বৈশিষ্ট্য। হাইপোম্যাগনেশেমিক টিটানি গাভীর গর্ভাবস্থা ও বাচ্চা প্রসবের সাথে সম্পর্কিত নয়। তবে গাভীর ল্যাকটেশন পিরিয়ডের সর্বাধিক দুধ উৎপাদনকালীন পিরিয়ডে অর্থাৎ বাচ্চা প্রসবের দুমাসের মধ্যে এরোগের প্রাদুর্ভাব সর্বোচ্চ। তাই গাভীর এ রোগকে ল্যাকটেশন টেটানি বলা হয়। কচি সরস ঘাসে ম্যাগনেশিয়ামের পরিমাণ খুব সামান্য থাকে। তাই যে সব প্রাণিকে

শুধুমাত্র কচি ঘাস খাওয়ানো হয় সে সব পশুর দেহে হাইপোম্যাগনেশেমিয়া সৃষ্টি হয়। এতে টেটানি ও খিঁচুনি দেখা দেয়। প্রাণীর কেবল ঘাস খাওয়ার কারণে এ রোগ হয় বলে এ রোগকে গ্রাস টেটানি বলে। আবার কচি ঘাস খাওয়ানোর ফলে হাইপোম্যাগনেশেমিয়ার কারণে প্রাণির টলমল (stagger) চলনভঙ্গি হয়, তাই এ রোগকে গ্রাস স্ট্যাগারাসও বলা হয়। কচি সরস শস্যেও (যেমন গমের) খাওয়ার ফলে পশুর বিষক্রিয়া সদৃশ হাইপোম্যাগনেশেমিক টেটানি সৃষ্টি হয়। তখন এ রোগকে হুইট পাসচার পয়জনিং বলা হয়। শুধু গমের সরস পাতা খাওয়ার ফলেই শুধু নয় জই, বার্লিসহ অন্যান্য প্রায় সকল খাদ্যশস্যেও কচি সরস ঘাস খাওয়ার ফলে এ রোগ হতে পারে। গরু, মহিষ, মেষ, ছাগল, উট, ইত্যাদি প্রাণির এ রোগ হবার তথ্য রয়েছে।

কারণতত্ত্ব:

দেহের শতকরা ৫০ ভাগ ম্যাগনেশিয়াম থাকে অস্থিতে, ৪৫ ভাগ থাকে ইন্ট্রসেলুলার ক্যাটায়ন হিসেবে। অবশিষ্ট ৫ ভাগ এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইডে হাইপোম্যাগনেশেমিয়া টিটানির কারণতত্ত্ব অনুধাবনের জন্য ম্যাগনোশিয়ামের সাধারণ কার্যাবলী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

চিকিৎসা:

রোগাক্রান্ত প্রাণীর রক্তের বায়োকেমিক্যাল পরীক্ষা ও চিকিৎসায় ফলোদয়ের উপর ভিত্তি করে চিকিৎসা প্রয়োগ করলে অধিক সুফল পাওয়া যায়।

- ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম সলুশন ইনজেকশন প্রতিটি আক্রান্ত গরুকে ৫০০ মিলিলিটার ক্যালসিয়াম বোরোগ্লুকোনেট ২৫% এবং ৫% ম্যাগনেশিয়াম হাইপোফসফেটের সমন্বয়ে অর্ধেক শিরায় এবং অর্ধেক ত্বকের নিচে ইনজেকশন দিয়ে চিকিৎসা করতে হয়। মেষ ও ছাগলে ক্ষেত্রে ৫০ মিলিলিটার ইনজেকশন করতে হয়।
- ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেশিয়ামের সমন্বয়ে ইনজেকশন দেয়ার পর ২০% ম্যাগনেশিয়াম সালফেট সলুশন ২০০-৩০০ মিলিলিটার পরিমাণ শিরা ও ত্বকের নিচে ইনজেকশন দেয়া যায়।
- ম্যাগনেশিয়াম সালফেটের পরিবর্তে ম্যাগনেশিয়াম ল্যাকটেট ৩.৩% সলুশন, ২.২মিলিলিটার/কেজি অথবা ম্যাগনেশিয়াম গ্লুকোনেট ১৫% সলুশন ২০০-৪০০ মিলিলিটার করে প্রতিটি গাভীকে অথবা ১২% ম্যাগনেশিয়াম অ্যাডিপেট ও ৫% ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেটের সমন্বয়ে ৫০০ মিলিলিটার গাভীর শিরা ও ত্বকের নিচে ইনজেকশন প্রয়োগে কার্যকর।

প্রতিরোধ:

- খাদ্যে ম্যাগনেশিয়াম সরবরাহ করতে হবে
- ম্যাগনেসাইট যার মধ্যে শতকরা ৮৭ ভাগ ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড থাকে। গাভীকে প্রতিদিন ৬০ গ্রাম করে লালী গুড়ের সাথে মিশেয়ে খাওয়ানো যায়। মেষ ও ছাগলের জন্য প্রত্যহ ৭ গ্রাম অথবা একদিন পরপর ১০ গ্রাম করে খাওয়ানো যায়।
- ম্যাগনেশিয়াম ফসফেট প্রত্যহ ৫৩ গ্রাম করে গাভীকে খাওয়ানো যায়।
- ম্যাগনেশিয়াম বুলেট-যে সব এলাকায় বা দেশে মাটি ঘাসে ম্যাগনেশিয়ামের ঘাটতি থাকে সেসব এলাকায় রোমন্থক পশুর রেটিকুলামে ম্যাগনেশিয়ামের বুলেট রাখা হয়। এই বুলেট থেকে অবিরতভাবে (গাভীর ক্ষেত্রে ১ গ্রাম) দেহে শোষিত হয়।
- ম্যাগনেশিয়াম সমৃদ্ধ কৃষি সার ঘাসে স্প্রে করে পশুকে সে ঘাস খাওয়ালে এ রোগ প্রতিরোধ হয়। যেমন ক্যালসিনেড ম্যাগনিসাইট ৫৬০ কেজি/হেক্টও জমিতে এক বার স্প্রে করলে ১-৩ বছর প্রতিরোধ করতে সক্ষম। এছাড়া ম্যাগনেশিয়াম সালফেট ২% সলুশন ১৫ দিন অন্তর স্প্রে করে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।
- চারণ ভূমি ও প্রাণী পালনের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা। চারণ ভূমিতে মটর ও খেসাড়ি আবাদ করতে হবে এবং প্রাণীকে ঘাসের পাশাপাশি শস্যদানা, খড় খাওয়াতে হবে। এছাড়া দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার, প্রাণী স্থানান্তরের সময় দুধ দানকালে পর্যাপ্ত সুষম খাদ্য সরবরাহ করে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

দুধ উৎপাদনকারী গরুর খামার পরিকল্পনা (১০/১০০টি গাভী)

খামারের সারাংশ

১।	প্রকল্পের ধরণ	:	দুগ্ধ খামার
২।	গাভীর সংখ্যা ও ধরণ	:	১০ টি উন্নত জাতের দুধালো গাভী
৩।	দুধালো গাভীর সংখ্যা	:	৬টি (৬০%)
৪।	দুধ উৎপাদন কাল	:	৩৬৫ দিন
৫।	প্রকল্পের মোট ব্যয়	:	টাঃ ১৫,১৪,৯০০.০০
৬।	বিনিয়োগের উৎস		
	(ক) ব্যাংক ঋণ		টাঃ ১০,৩৩,৫০০.০০
	(খ) ইকুইটি		টাঃ ৪,৮১,৪০০.০০
৭।	ঋণ ইকুইটি অনুপাত		
(প্রাথমিক পরিচালনা ব্যয় সহ)			৬০ ঃ ৪০
৮।	গাভীর মূল্য (প্রতিটি)		টাঃ ১,০০,০০০.০০
৯।	দুধ উৎপাদন (গাভী প্রতি দৈনিক)		৬-৮ লিটার/দিন (গড়ে ৭ লিটার)
১০।	দুধ বিক্রয় মূল্য (আনুমানিক)		টাঃ ৬৫.০০/লিটার
১১।	ঋণের মেয়াদ		৭ বছর (গ্রেস পিরিয়ডসহ)

খামারের উৎপাদন পরিকল্পনা

১।	মোট গাভীর সংখ্যা	:	১০টি
২।	দুধালো গাভী (৬০%)	:	৬টি
৩।	দুগ্ধ বিহীন গাভী (৪০%)	:	৪টি
৪।	বাছুর		
	১ম বছর		
	(১) ষাঁড় বাছুর	:	৩টি
	(২) বকনা বাছুর	:	৩টি
	১ বছর বয়স্ক		
	(১) ষাঁড় বাছুর	:	৩টি
	(২) বকনা বাছুর	:	৩টি
	দ্বিতীয় বছর		
	(১) ষাঁড় বাছুর	:	৩টি
	(২) বকনা বাছুর	:	৩টি
	২ বছর বয়স্ক		
	(১) ষাঁড় বাছুর (ষাঁড় বাছুর বিক্রয় হবে)	:	২টি
	(২) বকনা বাছুর	:	৩টি
	১ বছর বয়স্ক		
	(১) ষাঁড় বাছুর	:	৩টি
	(২) বকনা বাছুর	:	২টি
	(বিঃ দ্রঃ- বাছুর মৃত্যু হিসেবে ধরা হলো)		

৩য় ও তদুর্ধ বছর

১ বছর বয়স্ক

(১) ষাঁড় বাছুর : ৩টি

(২) বকনা বাছুর : ৩টি

২ বছর বয়স্ক

(১) ষাঁড় বাছুর

(ষাঁড় বাছুর বিক্রয় হবে) : ২টি

(২) বকনা বাছুর : ৩টি

৩ বছর ও তদুর্ধ বয়স্ক

(১) বকনা বাছুর

(২টি বদল করা হবে ও ১টি বিক্রি করা হবে) : ৩টি

প্রকল্প ব্যয়

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
১।	প্রকল্প জমি (১০ শতাংশ)	১০ শাতাংশ
২।	গো-শালা ও অন্যান্য পুনঃনির্মাণ	টাঃ ২,৩০,০০০.০০
৩।	সরঞ্জামাদি	টাঃ ৩০,০০০.০০
৪।	আসবাবপত্র	টাঃ ৮,০০০.০০
৫।	১০টি উন্নত জাতের গাভী	টাঃ ১০,০০০,০০.০০
৬।	উৎপাদন পূর্ব ব্যয়	টাঃ ৮,০০০.০০
৭।	মুদ্রাস্ফীতি, কন্টিনজেন্সী/আনুষাঙ্গিক ব্যয়	টাঃ ২,১৩,৪০০.০০
৮।	প্রাথমিক পরিচালনা ব্যয়	টাঃ ২৫,৫০০.০০
	মোট প্রকল্প ব্যয়	টাঃ ১৫,১৪,৯০০.০০
	বিনিয়োগের উৎসঃ	
	ব্যাংক ঋণ	টাঃ ১০,৩৩,৫০০.০০
	ইকুইটি	টাঃ ৪,৮১,৪০০.০০
	মোট	টাঃ ১৫,১৪,৯০০.০০

ব্যাংক ঋণ ও উদ্যোক্তার বিনিয়োগের অনুপাত ঃঃ ৬০ঃ৪০

খামারের আয় (আনুমানিক)

ক্রমিক নং	বিবরণ	১ম বছর	২ বছর	৩য় ও তদুর্ধ বছর
১।	৬টি গাভী প্রতিদিন ৭ লিটার হিসেবে ৩৬৫ দিনে মোট ১৫,৩৩০ লিটার দুধ উৎপাদন, প্রতি লিটার ৬৫/০০ টাকা হিসেবে।	টাঃ ৯,৯৬,৪৫০.০০	টাঃ ৯,৯৬,৪৫০.০০	টাঃ ৯,৯৬,৪৫০.০০
২।	২ বছর বয়সের ২টি ষাঁড় বাছুর বিক্রয় প্রতিটি ৫০,০০০/- টাকা হিসেবে।	--	টাঃ ১০০,০০০.০০	টাঃ ১০০,০০০.০০
৩।	৩ বছর বয়সের ১টি বকনা বাছুর বিক্রয়	--	--	টাঃ ৭৫,০০০.০০

ক্রমিক নং	বিবরণ	১ম বছর	২ বছর	৩য় ও তদুর্ধ বছর
৪।	২টি বদলকৃত গাভী বিক্রয় প্রতিটি ৭০,০০০/- টাকা হিসেবে।	--	--	টাঃ ৮০,০০০.০০ টাঃ ১,৪০,০০০.০০
৫।	গোবর বিক্রয়	টাঃ ৩০,০০০.০০	টাঃ ৩৫,০০০.০০	টাঃ ৪০,০০০.০০
	মোট:	টাঃ ৭,০৯৮৫০.০০	টাঃ ৭,৮৪,৮৫০.০০	টাঃ ৯,২৪,৮৫০.০০

পরিচালনার ব্যয়

ক্রমিক নং	বিবরণ	১ম বছর	২ বছর	৩য় ও তদুর্ধ বছর
১।	খাদ্য ব্যয়	টাঃ ৪,৯৮,১২০.০০	টাঃ ১,৫০,০৮০.০০	টাঃ ১,৫০,০৮০.০০
২।	শ্রম ব্যয়	টাঃ ১,৪৬,০০০.০০	টাঃ ২৯,২০০.০০	টাঃ ২৯,২০০.০০
৩।	ষ্টোর ও স্প্রেয়ার্স মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ	টাঃ ৫,০০০.০০	টাঃ ৫,০০০.০০	টাঃ ৫,০০০.০০
৪।	ভাতা, কর/বীমা ইত্যাদি	--	টাঃ ২,০০০.০০	টাঃ ২,০০০.০০
৫।	পানি, তৈল এবং বিদ্যুৎ	টাঃ ৬,২০০.০০	টাঃ ৬,২০০.০০	টাঃ ৬,২০০.০০
৬।	অপচয়	টাঃ ১৩,৪৪০.০০	টাঃ ১৩,৪৪০.০০	টাঃ ১৩,৪৪০.০০
৭।	ঔষধাদি ও কৃত্রিম প্রজনন ব্যয়	টাঃ ৫,০০০.০০	টাঃ ৫,০০০.০০	টাঃ ৫,০০০.০০
	মোট:	টাঃ ৬,৭৩,৭৬০.০০	টাঃ ৬,৭৫,৭৬০.০০	টাঃ ৬,৭৫,৭৬০.০০

স্থায়ী ব্যয়ঃ বিস্তারিত প্রকল্প ব্যয়

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ
১।	প্রকল্প জমি (১০ শতাংশ)	নিজস্ব
২।	উন্নত জাতের ১০টি গাভী প্রতিটি ১,০০,০০০.০০ টাকা হিসেবে (১,০০,০০০.০০X১০)	টাঃ ১০,০০,০০০.০০
৩।	গোয়াল ঘর (স্বল্প ব্যয়) প্রতিটি গাভীর জন্য ৮'X৪'= ৩২ বর্গফুট এবং প্রতিটি বাছুরের জন্য ৫'X৪' = ২০ বর্গফুট। মোট ৭২০ বর্গফুট টিনের চালা, কাঠের খুটি, ইটের মেঝে ও খাবার চাড়িসহ প্রতি বর্গফুট ২৫০.০০ টাকা হিসেবে।	টাঃ ১,৮০,০০০.০০
৪।	জায়গা উন্নয়ন	টাঃ ৫০,০০০.০০
	উপ-সমষ্টি	টাঃ ১২,৩০,০০০.০০
৫।	ডেইরী সরঞ্জামাদিঃ (ক) বড় বালতি ২টি, ছোট বালতি ২টি, দুধের ড্রাম ১টি, মাপ চোং ১টি, কোদাল ১টি, দা-কাঁচি ২টি, মগ ১টি, ব্রাস ৬টি, ফ্ল্যাস্ক ১টি, হুস পাইপ ২৫ গজ, টুকরী ২টি, ঝাড়ুর শলা ৫ কেজি ইত্যাদি।	টাঃ ৫,০০০.০০
	(খ) হস্তচালিত টিউবওয়েল ১টি	টাঃ ১৫,০০০.০০
	(গ) দুধ বহনের জন্য রিকসা ভ্যান ১টি	টাঃ ১০,০০০.০০
	উপ-সমষ্টি	টাঃ ৩০,০০০.০০
৬।	আসবাবপত্র (চেয়ার, টেবিল, টুল ইত্যাদি)	টাঃ ৮,০০০.০০
৭।	উৎপাদন পূর্ব ব্যয় ঋণের আবেদন পত্র ক্রয়, প্রকল্প মূল্যায়ন ফি, দলিলাদি সম্পাদন ইত্যাদি	টাঃ ৮,০০০.০০

ক্রমিক নং	বিবরণ		পরিমাণ
৮।	মুদ্রাস্ফীতি, কন্টিনজেন্সী/আনুষাঙ্গিক ব্যয় (৩-৬ এর উপর ৫% + গাভী ক্রয়ের উপর ২০%) টাঃ ৫৬,৩৯০.০০		টাঃ ২,১৩,৪০০.০০
৯।	প্রাথমিক পরিচালনা ব্যয়		টাঃ ২৫,৫০০.০০
		মোট	টাঃ ১৫,১৪,৯০০.০০

ব্যাংক ঋণ

ক্রমিক নং	বিবরণ		পরিমাণ
১।	গরুর মূল্য		টাঃ ১০,০০,০০০.০০
২।	উৎপাদন পূর্ব ব্যয়		টাঃ ৮,০০০.০০
৩।	প্রাথমিক পরিচালনা ব্যয়		টাঃ ২৫,৫০০.০০
		মোট	টাঃ ১০,৩৩,৫০০.০০

	চলতি ব্যয়	প্রথম বছর	পরবর্তী বছর
১।	শ্রমিক ২জন দৈনিক ৪০০.০০ টাকা হিসেবে ১ বছরের খরচ দানা খাদ্য	টাঃ ২,৯২,০০০.০০	টাঃ ২,৯২,০০০.০০
২।	৬টি দুধালো গাভীর দানা খাবার (গড়ে ৭ লিটার দুধ) প্রতিটি গাভীর দৈনিক ৫ কেজি করে ৩৬৫ দিনে ১০,৯৫০ কেজি এবং দুগ্ধ বিহীন ৪টি গাভীর দৈনিক প্রতিটির জন্য ৩ কেজি হিসেবে ৪,৩৮০ কেজি মোট ১৫,৩৩০ কেজি, প্রতি কেজি ২৮.০০ টাকা হিসেবে।	টাঃ ৪,২৯,২৪০.০০	টাঃ ৪,২৯,২৪০.০০
৩।	১০টি বাছুরের জন্য দৈনিক ১ কেজি হিসেবে ৩৩০ দিনে (৩৩০x১x১০)=৩,৩০০ কেজি প্রতি কেজি ২৮.০০ হিসেবে।	টাঃ ৯২,৪০০.০০	টাঃ ৯২,৪০০.০০
৪।	আঁশ জাতীয় খাদ্য		
	(ক) খড় প্রতিটি গাভীর জন্য দৈনিক ৫ কেজি হিসেবে ১০ গাভীর ৩৬৫ দিনের (১০x৫x৩৬৫) = ১৮,২৫০ কেজি এবং প্রতিটি বাছুরের জন্য দৈনিক ০.৫ কেজি হিসেবে ১০টি বাছুরের ৩৩০ দিনে (১০x.৫x৩০)=১,৬৫০ কেজি (১৮,২৫০+১,৬৫০)=১৯,৯০০ কেজি প্রতি কেজি ৪.০০ টাকা হিসেবে।	টাঃ ৭৯,৮০০.০০	টাঃ ৭৯,৮০০.০০
	(খ) কাঁচা ঘাস প্রতিটি গাভীর জন্য দৈনিক ১৫ কেজি হিসেবে ১০টি গাভীর ৩৬৫ দিনের খাদ্য ৫৪,৭৫০ কেজি এবং প্রতিটি বাছুরের জন্য দৈনিক ৫ কেজি হিসেবে গড়ে ১০টি বাছুরের ৩০০ দিনের খাদ্য ১৫,০০০ কেজি (৫৪,৭৫০+১৫,০০০)=৬৯,৭৫০ কেজি প্রতি কেজি ১.৫০ টাকা হিসেবে।	টাঃ ১০৪,৬২৫.০০	টাঃ ১০৪,৬২৫.০০

	চলতি ব্যয়		প্রথম বছর	পরবর্তী বছর
৫।	জরুরী ঔষধ পত্র ও কৃত্রিম প্রজনন ব্যয়		টাঃ ৫,০০০.০০	টাঃ ৬০০০.০০
৬।	বিদ্যুৎ বাবদ		টাঃ ৬,২০০.০০	টাঃ ৬,২০০.০০
৭।	অবচিত মূল্য ৫% (ঘর ও সরঞ্জামাদির উপর) (২৬৮৮০০.০০)		টাঃ ১৩,৪৪০.০০	টাঃ ১৩,৪৪০.০০
৮।	সেড মেরামত		টাঃ ৫,০০০.০০	টাঃ ৫,০০০.০০
		মোট:	টাঃ ৬,৭৩,৭৬০.০০	টাঃ ৬,৭৩,৭৬০.০০

আয়-ব্যয় সংক্ষিপ্ত সার

(১)	প্রথম বছরের আয়	টাঃ ১০,২৬,৪৫০.০০
	প্রথম বছরের ব্যয়	টাঃ ৯,৯৮,০৬৫.০০
	প্রকৃত আয়	টাঃ ২৮,৩৮৫.০০
(২)	দ্বিতীয় বছরের আয়	টাঃ ১১,৩১,৪৫০.০০
	দ্বিতীয় বছরের ব্যয়	টাঃ ১০,০০,০৬৫.০০
	প্রকৃত আয়	টাঃ ১,৩১,৩৮৫.০০
(৩)	তৃতীয় বছরের আয়	টাঃ ১৩,৫১,৪৫০.০০
	তৃতীয় বছরের ব্যয়	টাঃ ১০,০০,০৬৫.০০
	প্রকৃত আয়	টাঃ ৩,৫১,৩৮৫.০০
(খ)	ব্যাংক ঋণ পরিশোধের তফসিল	
	মোট ঋণের পরিমাণ	টাঃ ১০,৩৩,৫০০.০০
	সুদের হার	টাঃ ৬%
	মোট কিস্তি	২৫টি
	কিস্তির পরিমাণ	টাঃ ৪১,৩৪০.০০

বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসেব

	১ম বছর	২য় বছর	৩য় বছর	৪র্থ বছর	৫ম বছর	৬ষ্ঠ বছর	৭ম বছর
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
স্থুল আয়	২৮,৩৮৫.০০	১,৩১,৩৮৫.০০	৩,৫১,৩৮৫.০০	৩,৫১,৩৮৫.০০	৩,৫১,৩৮৫.০০	৩,৫১,৩৮৫.০০	৩,৫১,৩৮৫.০০
পরিশোধিত কিস্তি		৪১,৩৪০.০০	৪১,৩৪০.০০	৪১,৩৪০.০০	৪১,৩৪০.০০	৪১,৩৪০.০০	৪১,৩৪০.০০
বার্ষিক সুদ	৬২,০১০.০০	৬২,০১০.০০	৫৯,৫২৯.০০	৫৭,০৪৯.০০	৫৪,৫৬৯.০০	৫২০৮৯.০০	৪৯৬০৯.০০
প্রকৃত আয়	-	২৮,০৩৫.০০	২,৫০,৫১৬.০০	২,৫২,৯৯৬.০০	২,৫৫,৪৭৬.০০	২,৫৫,৪৭৬.০০	২,৬০,৪৩৬.০০

দুধের মিনি পাস্তুরিকরণ ও সংরক্ষণ প্রযুক্তি

পটভূমি

পচনশীল তরল পদার্থ দুধ উৎপাদনের পর যথাযথভাবে সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের মধ্যে কোন সমন্বয় নেই। বাংলাদেশে মোট দুধের বেশিরভাগই উৎপাদিত হয় গ্রামাঞ্চলে, এর বিপরীতে ভোক্তাদের অধিকাংশ বাস করেন নগরাঞ্চলে। দুধ উৎপাদকের হাত থেকে ভোক্তাদের হাতে পৌঁছানোর জন্য অবশ্যই প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে হয়েই আসতে হবে। এখানেই দুগ্ধ খাতের প্রধান সমস্যা। কারণ, দুগ্ধ খাতে এখন পর্যন্ত যে বিনিয়োগ হয়েছে তা এলাকাভিত্তিক বিনিয়োগের মধ্যে সীমিত। এসব বিনিয়োগ কখনো গোটা দেশকে আওতার মধ্যে আনতে পারেনি। যার ফলে, নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চল ছাড়া দুধের বাজারে এই বিনিয়োগ তেমন কোন সুফল বয়ে আনেনি। কিন্তু যদি দেশের প্রধান প্রধান দুধ উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলোতে তো বটেই, সেই সাথে উৎপাদন ক্ষমতা বুঝে প্রতিটি জেলায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপজেলাগুলোতেও যদি একটি করে দুধ সংরক্ষণ কেন্দ্র তৈরি করা যেত, তাহলে উৎপাদকরা দুধ নষ্ট হয়ে যাবার ভয়ে তাড়াতাড়ি গোয়ালাদের কাছে বিক্রি করে দিত না, নির্দিষ্ট দামে সংরক্ষণ কেন্দ্রে সরবরাহ করতো। তেমনি দু-এক দিন সংরক্ষণ কেন্দ্রে রেখে প্রক্রিয়াজাত করে পাঠালে পরিবহনসহ অন্যান্য সবদিকেই খরচ কমে যেত। দুধের বাজারে স্থিতিশীল অবস্থা তৈরী হলে ভোক্তারাও ন্যায্য দামে দুধ কিনতে পারত। সিরাজগঞ্জ-পাবনা সমবায়ের ক্ষেত্রে সমিতির আওতায় যারা আছে, মিল্ক ভিটা তাদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট দামে দুধ কিনে নিয়ে নিজস্ব চিলিং সেন্টারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। এতে সমিতির আওতাভুক্ত চাষীরা দাম নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে না। ঐ এলাকায় মিল্কভিটা বা অন্যান্য সকল কোম্পানির চিলিং সেন্টার থাকার পরও দুধ উৎপাদনে এগিয়ে থাকার কারণে বিনিয়োগ ঐ এলাকায়ও পর্যাপ্ত নয়। এখনো ঐ এলাকায় প্রচুর উৎপাদক বাইরের মধ্যসত্বাভোগীদের কাছে কম দামে দুধ বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। চিলিং সেন্টারগুলোর ধারণক্ষমতা যদি পর্যাপ্ত থাকতো তাহলে, এই লোকগুলো বাইরে দুধ বিক্রি করতো না, ফলে এই এলাকায় দুধের বাজার কখনো অস্থির হতো না। অতএব, নিঃসন্দেহে বলা যায়, প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা যদি সব এলাকায় নাও থাকে, সংরক্ষণ কেন্দ্র যদি থাকে, তাহলে দুধের বাজার স্থিতিশীল হবে।

প্রযুক্তির বর্ণনা

বাংলাদেশের যে কোনো অঞ্চলে প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্ট তৈরী করা সম্ভব। ছকে উল্লেখিত যন্ত্রপাতি দিয়ে দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা স্থাপন করা যায়। স্থানীয়ভাবে মিষ্টি প্রস্তুতকারীরা বা এই ব্যবসার সাথে জড়িত ব্যক্তিরা ছোট পরিসরে অল্প মূলধন দিয়ে দুধ সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের কাজ করতে পারেন।

একটি মিনি পাস্তুরিকরণ প্লান্ট

মিনি-পাস্তুরিকরণ প্লান্টের অংশ সমূহ

ক্রমিক নং	অংশের নাম	ধারণ ক্ষমতা	পরিমাণ	আনুমানিক মূল্য
১.	পাস্তুরিকরণ ও ঠান্ডাকরণ মেশিন	৫০ লিঃ/ঘন্টা	১	২,৭০,০০০.০০
২.	মিনিপৃথকিকরণ মেশিন	৬৫ লিঃ/ঘন্টা	১	৩০,০০০.০০
৩.	ননি পরীক্ষাকরণ মেশিন	৮ নমুনা	১	২০,০০০.০০
৪.	দই তৈরীকরণ মেশিন	২৫ লিঃ দুধ	১	২০,০০০.০০
৫.	ব্লেন্ডার মেশিন	-	১	১০,০০০.০০
৬.	দুগ্ধ সংরক্ষণ যন্ত্র	১০০ লিঃ	১	৫০,০০০.০০
	মোট			**৪,০০,০০০.০০**

বিঃদ্রঃ সময়ের পরিবর্তনে মিনি পাস্তুরিকরণ প্লান্ট অংশের মূল্য পরিবর্তন শীল।

দুধ পাস্তুরিকরণ এবং ঠান্ডাকরণ

এই মেশিনে দুই অংশ আছে। একটিতে দুধ পাস্তুরিকরণ এবং অন্যটিতে দুধ ঠান্ডা করা হয়। প্রতি ব্যাচে ৫০ লিঃ দুধ পাস্তুরিকরণ করা যায়। দুধ পাস্তুরিকরণ করার পূর্বে দুধকে মাপ অনুসারে (১/২ লিঃ অথবা ১ লিঃ) ফুড গ্রেট পলিথিন থলিতে নিতে হবে এবং পলিথিন থলিটি হাড মেশিনের সাহায্যে মুখটি বন্ধ করতে হবে। সঠিকভাবে পলিথিন থলি বন্ধ ছিল কিনা না তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে, প্রয়োজন হলে দু'বার সিলিং মেশিনে চাপ প্রয়োগ করত হবে। পলিথিন থলিগুলোতে দুধ ভরার পর পাস্তুরিকরণ ইউনিটে ৬৮০ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৩০ মিনিট রাখার পর ঠান্ডাকরণ ইউনিটে স্থানান্তর করতে হবে এবং ঠান্ডাকরণ ইউনিটে ৩০ মিনিট রাখতে হবে। অতঃপর ঠান্ডাকরণ ইউনিট থেকে নামিয়ে এনে ৪০°সেলসিয়াস তাপমাত্রার নীচে সংরক্ষণ করে পরবর্তীতে ব্যবহার করা যাবে।

দুধ পাস্তুরিকরণের সময় করণীয়

- লাইনে বিদ্যুৎ সরবরাহ সঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করা
- বিদ্যুৎ লাইন চালুর ৩ মিনিট পর পাস্তুরিকরণ ইউনিট চালু করতে হবে
- অতঃপর কুলিং ইউনিট চালু করতে হবে।
- মেশিন চালু করে দুধ প্যাকেটিং করতে হবে; এতে সময়ের অপচয় রোধ হবে

প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে প্রযুক্তিটির আর্থ-সামাজিক উপযোগীতা

বাংলাদেশের গ্রামে প্রায় সব বাড়িতেই গাভী পালন করা হয়। ঐতিহ্যগতভাবে চাষীরা গাভী দিয়েই হাল চাষের মতো কষ্টসাধ্য কাজ করানোর পাশাপাশি দুধও উৎপাদন করে। যেহেতু গরু পালনকারীর সংখ্যা উল্লেখ করার মতো, সেহেতু গ্রামীণ বাজারগুলোতে নিয়মিত দুধের বিকিকিনি হয়ে থাকে। কিন্তু ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ ঘটে না। মাঝখানে মধ্যস্বত্বভোগীদের জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতা দুধের ন্যায্য মূল্য পায় না। যার ফলে দুধের বাজার অস্থির হয়ে ওঠে। এই মধ্যস্বত্বভোগীদের আমরা তিনভাবে দেখতে পাই-

ক. গোয়ালা: সাধারণত এরা উৎপাদকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে দুধ সংগ্রহ করে আড়তদার, বাঁধা বাড়িওয়ালা, রেস্টুরেন্ট, চায়ের দোকান এইসব জায়গায় বিক্রি করে। কিছু দুধ ছানা বানিয়ে মিষ্টি বিক্রেতাদের কাছেও বিক্রি করে।

খ. আড়তদার: এরা সাধারণত কমিশন এজেন্ট। দুধের বাজারে ছোট ছোট উৎপাদক, গোয়ালা বা আরোও যারা দু সরবরাহের সাথে জড়িত তাদের কাজ থেকে দুধ ক্রয় করে কিছুক্ষণ নিজের কাছে মজুদ রেখে বড় কোন প্রক্রিয়াজাতকারী কোম্পানির কাছে বেশী লাভে বিক্রি করে।

গ. ক্ষুদ্র আকারের প্রক্রিয়াজাতকারী বা খুচরা বিক্রেতা: এরাও অনেকটা আড়তদারদের মতো দুধ সংগ্রহ করে একত্রিত করে। পরে বড় কোনো শহরের বাজারে নিয়ে বিক্রি করে।

এছাড়াও এদের সাথে সংশ্লিষ্ট আরো কিছু লোক মধ্যস্বত্বাভোগী হিসেবে অহেতুক দাম বাড়ায়। একটি ছকের মাধ্যমে এদের অবস্থান উপস্থাপন করা হল।

মধ্যস্বত্বভোগী	সরাসরি জড়িতদের সংখ্যা	সংশ্লিষ্টভাবে জড়িতদের	মোট
গোয়ালা	১.৫০ জন	২.৯ জন	৩.৪০ জন
আড়তদার	০.০২ জন	০.০০০১ জন	০.০২০১ জন
ক্ষুদ্র আকারের প্রক্রিয়াজতকারী	৫.৬০ জন	৪.৪ জন	১০ জন

বর্তমানে বাংলাদেশে ছোট-বড় কিছু দুগ্ধ খামার এবং সরাসরি ও ব্যক্তিগত মালিকানায় কিছ কোম্পানি দুধ সংরক্ষণের বৈজ্ঞানিক কিছু উপায় ব্যবহার করে থাকে। দুধ সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে বাংলাদেশে সব পর্যায়ে সমভাবে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় না। সরকারি একটি এবং বেসরকারী বেশ কয়েকটি কোম্পানি দুধের বাজারের সম্ভাবনা বিচার করে এই পর্যায়ে বিশাল অঙ্কের বিনিয়োগ করলেও তা চাহিদার তুলনায় খুবই অপ্রতুল। বিশেষ করে, বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে এই সুবিধা নেই বললেই চলে। এদিক থেকে বিবেচনা করলে প্রযুক্তিটির আর্থ-সামাজিক উপযোগীতা রয়েছে।

পরিবেশ দূষণরোধ, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিরাপত্তায় প্রযুক্তিটির অবদান-

দুধ দ্রুত পচনশীল তরল পদার্থ। দোহনের পর দ্রুত প্রক্রিয়াজাতকরণ করতে হয়। দুধ প্রক্রিয়াজাত বলতে আমরা সাধারণভাবে বুঝি, মূল রূপ থেকে একে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যবহারিক কোনো রূপে অথবা ব্যবহারিক রূপের সাহায্যকারী কোনো অবস্থায় রূপান্তর করা। দুধ থেকে আমরা নানা ধরনের খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত ছাড়াও তরল দুধ জীবাণুমুক্ত

করে ব্যবহার করে থাকি। প্রক্রিয়াজাতকরণের অভাবে দুধ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায় না। এরজন্য দুধ উৎপাদনের ভালো ব্যবস্থা, সুষ্ঠু সংরক্ষণ ব্যবস্থা, সেই সাথে সংরক্ষিত পণ্যকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যবহার উপযোগী করে তোলার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। আর প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য প্রয়োজন শিল্পসম্মত ও অল্প দামের যন্ত্রপাতি। বাংলাদেশে এই ব্যবস্থাগুলো নেই বললেই চলে। দুধ উৎপাদন করা হয় মূলত দুটি উদ্দেশ্যে- নিজস্ব ব্যবহার ও বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন। নিজের খাওয়ার জন্য অল্প পরিমাণ দুধ রেখে সব উৎপাদনকারীই দুধ বিক্রি করে থাকেন। অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে দুধ উৎপাদন হলে স্বাভাবিকভাবে সেখানে দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণের বিষয় এসে পড়ে।

স্বাভাবিক অবস্থায় দুধ সংরক্ষণের চাইতে প্রক্রিয়াজাত অবস্থায় দুধ সংরক্ষণ অনেক সহজ। চাহিদার দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায় তরল দুধের চাইতে প্রক্রিয়াজাত দুধ এবং তা থেকে তৈরী করা বিভিন্ন সামগ্রীর চাহিদা বেশি।

প্রযুক্তিটি ব্যবহারে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ এবং পুষ্টি নিরাপত্তায় অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

ব্যবহারের ক্ষেত্র এবং লাভ ক্ষতির হিসাব-

সমিতি গঠনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উৎপাদক একত্রিত হয়ে দুধ প্রক্রিয়াজাতের ব্যবস্থা করতে পারে। এক্ষেত্রে, তারা দলীয় সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করে গরু কিনতে পারে, জমির ব্যবস্থা করে তাতে ঘর করতে পারে এবং সেই ঘরে বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে পারে। কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করে তদারকির ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। এছাড়া, আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকের দুধ একত্রিত করেও প্রক্রিয়াজাত করা যেতে পারে।

একই কাজ একক উদ্যোগেও করা যেতে পারে। এতে মূলধন বেশি লাগলেও লাভও হবে বেশি। আমাদের দেশে সাধারণত মিষ্টি প্রস্তুতকারকরা তাদের নিজ উদ্যোগে দুধ প্রক্রিয়াজাত করার ব্যবস্থা করে থাকে।

বাংলাদেশে পারিবারিক ব্যবস্থা ছাড়াও বেশ কিছু জায়গায় ছোট ছোট খামারীরা স্বল্প পরিসরে দুধ উৎপাদন করে থাকে। এই চর্চার পরিসর দিন দিন বাড়ছে।

নিম্নলিখিত এলাকাগুলি পাস্তুরিকরণের জন্য বিবেচনায় রাখতে পারি

- গ্রামীণ এলাকা বিশেষত, প্রান্তিক অঞ্চল, যেসব জায়গা শহর থেকে বিচ্ছিন্ন অথচ সেখানে দুধ উৎপাদনের পরিমাণ যথেষ্ট।
- গবাদীপশুর খাদ্যের সহজ প্রাপ্যতা স্থান নির্বাচনে গুরুত্ব পাবে।
- উৎপাদক এলাকার ২০-৩০ বর্গমাইলের ভেতরে যেখানে কোনো প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা নেই।
- গ্রীষ্মপ্রধান এলাকা যেখানে দুধ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা বেশী

সেই হিসেবে বাংলাদেশের প্রায় এলাকাই সম্ভাব্যতা বিচারে এগিয়ে থাকবে। নীচের সারণিতে মিনি পাস্তুরিকরণ প্লান্টের আয়-ব্যয়ের হিসাব দেয়া হল।

সারণি-১: একটি মিনি পাস্তুরিকরণ প্লান্টের আয়-ব্যয়ের হিসাব

ক্রমিক নং	আইটেম		ইউনিট মূল্য	মোট মূল্য (টাকা)
১.	স্থায়ী মূলধনঃ			
	ক.	মেশিনারীর মূল্য	৪০০০০০.০০	৪০০০০০.০০
	খ.	কনস্ট্রাকশন খরচ	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০
	গ.	বিদ্যুতায়ন খরচ	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০
	ঘ.	জেনারেটর (১০ কেভিএ)	৬০০০০.০০	৬০০০০.০০
সাব-টোটাল				৫৮৫০০০.০০
২.	কার্যকরী মূলধন			
	ক.	দুধ ৩০০ লিঃ	প্রতি লিঃ টাঃ ৫০.০০ হি	১৫,০০০.০০
	খ.	শ্রমিক ব্যয় ৩০০ লিঃ	প্রতি লিঃ টাঃ ২.০০ হি	৬০০.০০
	গ.	পরিবহন ব্যয়	প্রতি লিঃ টাঃ ১.০০ হি	৩০০.০০
	ঘ.	বিদ্যুৎ খরচ	প্রতি লিঃ টাঃ ৮.০০ কেভি	২০০.০০
	ঙ.	প্যাকেটিং খরচ	প্রতি লিঃ ১ ম্যান ডে/সি	৩০০.০০
	চ.	পলিথিন খরচ	প্রতি লিঃ ১.০০/প্যাঃ	৩০০.০০
	ছ.	ডিটারজেন্ট খরচ		১০০.০০

ক্রমিক নং	আইটেম		ইউনিট মূল্য	মোট মূল্য (টাকা)
সাব-টোটাল				১২২০০.০০
৩.	অর্থনৈতিক বিশেষণ			
	ক.	দুধ বিক্রি	প্রতি টাঃ ৭০ হিঃ	২১,০০০.০০
৪.	মোট আয়			
	ক.	(৩-২)=১৬৫০০-১২২০০	-	৬,০০০.০০
	খ.	বাৎসরিক মোট		
৫.	নীট লাভ			
	ক.	অপচয় খরচ	@ ১০%	৫৮৫০০.০০
	খ.	ব্যাংকের সুদ	@ ১২%	৭৩১২৫.০০
সাব-টোটাল				১৩১৬২৫.০০

সুতরাং মেশিনটি বছরে ৩০০ দিন কার্যকরী থাকলে বাৎসরিক নীট লাভ (১৮,০০০০০-১৩১৬২৫)=১৬,৬৮,৩৭৫/- টাকা। উপরিউক্ত আলোচনায় দেখা যায়, একজন উদ্যোক্তা ৬.০ লক্ষ টাকা মিনি পাস্তুরিকরণ প্লান্ট স্থাপনে খরচ করে বছরে প্রায় ১৬,৬৮,৩৭৫/- টাকা আয় করতে পারে। মিনি পাস্তুরিকরণ প্লান্টের স্থানে যে ইনকিউবেটর আছে তা পাস্তুরিকরণ ছাড়াও প্রতিদিন ৫০ কেজি দুধের দই তেরী করে আরও আয় করতে পারে। সারণি-২ এ প্রতিদিন ১০ কেজি দই তৈরীর অর্থনৈতিক লাভ ক্ষতি প্রদান করা হল।

সারণি-২: প্রতিদিন ১০ কেজি দই তৈরীর হিসাব

আইটেম		পরিমাণ (কেজি)	একক মূল্য	মোট খরচ
১.	দুধ	১৩	৫০.০০	৬৫০.০০
২.	চিনি	১.৩	৯০.০০	১১৭.০০
৩.	ট্রাট্রার	০.০২ গ্রাম	-	১০.০০
৪.	মাটির পাত্র	১০	৫.০০	৫০.০০
৫.	জ্বালানী খরচ	-	-	১০০.০০
৬.	শ্রমিক	-	-	১০০.০০
৭.	অন্যান্য	-	-	১০০.০০
		মোট খরচ		১১২৭.০০
	আয়	১০ কেজি ১৫০.০০	১৫০	১৫০০.০০
	নীট আয়	(১৫০০-৮৯৩)		৩৭৩.০০

উপসংহার

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং বর্তমান দুধের বাজারজাতকরণের অবস্থার আলোকে দেখা যায় যে, যোগানের মাত্র ১০-১৫ ভাগ দুধ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাজারজাত হয়ে থাকে। সেখানে, এই ধরনের মিনি পাস্তুরিকরণ প্লান্ট কমিউনিটি ভিত্তিতে স্থাপন করতে পারলে; দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও মাঝারী আকারের ডেইরী খামারীরা উপকৃত হবে। আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ, দুধ বাজারজাতকরণ ও দুধের ন্যায্য মূল্য পেতে দুধের মিনি পাস্তুরিকরণ ও সংরক্ষণ প্লান্ট নিঃসন্দেহে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

দুগ্ধপণ্য উৎপাদনে দেশী প্রযুক্তি (দই এবং পনির)

পটভূমি

দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির মধ্যে দধি বাংলাদেশে অতি জনপ্রিয় একটি খাদ্য দ্রব্য। যতটুকু জানা যায় দধি বাংলাদেশ-পাক ভারত উপমহাদেশ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। গবেষণায় দেখা গেছে বাংলাদেশে সাধারণত: দুই ধরনের দধি মানুষের খাদ্য হিসেবে তৈরি করা হয়, মনমুগ্ধকর গন্ধ বিশিষ্ট মিষ্টি দধি এবং অম্লস্বাদ যুক্ত টক দধি। মিষ্টি দধি সাধারণত: সরাসরি খাদ্য হিসেবে এবং টক দধি রন্ধন প্রণালীতে ব্যবহার করা হয়, তবে দধি অধিক টক না হলে খাদ্যের সাথেও পরিবেশন করা হয়। বাংলাদেশ সহ কিছু দেশে দধি সাধারনত: সতেজ দুধ থেকে অথবা কিছু কিছু ক্ষেত্রে সতেজ দুধের সাথে শুষ্ক গুঁড়ো দুধ যোগ করে তৈরি করা হয়। বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলে দধি তৈরি হলেও বগুড়ার শেরপুর অঞ্চল এবং বরিশালের গৌরনদী অঞ্চল দধি তৈরি উৎপাদনের জন্য সুপ্রসিদ্ধ। "দধি" হলো এমন একটি গাঁজানো (Fermented) দুগ্ধজাত দ্রব্য যা সাধারণতঃ দুধ জ্বাল/তাপ দিয়ে দধি বীজ (Culture) যোগ করে তৈরি করা হয়"। মিষ্টি দধি তৈরিতে চিনি দেওয়া হয়। দধি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন

নামে যেমন, ইরানে "মাষ্ট", ইরাক"লেবানন", এবং মিশরে "লেবান", সিরিয়াতে "লেবেনী", ইটালীতে "গোধবু", বুলগেরিয়াতে "নাজা", সুদানে "জাবেদ", ইউরোপে "ইউগার্ট" এবং বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানে দধি,দহি বা দই নামে পরিচিত তবে এদের প্রস্তুত প্রণালী এবং স্বাদ কিছুটা ভিন্ন। সাধারণতঃ ইউগার্ট তৈরিতে তুলনামূলক ভাবে বেশী তাপ (৪৫-৫০° সেঃ) কম তাপান্বয়ন সময়ের (Incubation period) প্রয়োজন (৩ ঘন্টা) অন্যদিকে দধি তৈরিতে কম তাপ (৩৮-৪০° সেঃ) বেশী তাপান্বয়ন সময়ের প্রয়োজন (৬ ঘন্টা)। দধি তৈরিতে মিশ্রিত ব্যাকটেরিয়াল বীজ (Mixed culture) ব্যবহার করা হয়। অপরদিকে ইউগার্ট তৈরিতে সুনির্দিষ্ট ব্যাকটেরিয়াল বীজ ব্যবহার করা হয়।

বগুড়ার দধির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি

বাংলার প্রাচীন নগর, উত্তরবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র ও রাজধানী খ্যাত বগুড়ার আরেকটি পুরান ঐতিহ্য হচ্ছে বগুড়ার দই। বগুড়ার দই এর প্রকৃত জন্মভূমি হচ্ছে বগুড়া জেলা শহর থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত শেরপুর নামক জায়গায়। ইতিহাসবিদ্দের মতে, ব্রিটিশ আমলে বগুড়ার নওয়াব তার অধীনস্ত এক হিন্দু নায়েবের মাধ্যমে বগুড়ার শেরপুর থেকে গৌর গোপাল নামক দইয়ের এক কারিগরকে নিয়ে আসেন। নওয়াব তাকে দই তৈরির প্রয়োজনীয় সহযোগীতা এবং নওয়াববাড়ীর কাছেই স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ব্যবস্থা করে দেন। খুব অল্প দিনেই নওয়াব বাবুর দইয়ের সুনাম দেশ ছাড়িয়ে বিদেশের মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে। প্রচলিত হাড়ির দইয়ের পাশাপাশি গোপাল বাবুই প্রথম 'সরার' দইয়ের প্রচলন করেছিলেন (আরেফিনশুভ, যুগান্তর , ১৯ শে নভেম্বও,২০০৮)। গৌর গোপালের পাশাপাশি সে সময়ের উল্লেখযোগ্য কারিগরের নাম অনুসারে 'রফাতের দই', 'কুড়ানুর দই' ও 'মহরমের দই' জনপ্রিয়তার শীর্ষে ছিল। ব্রিটিশ আমল থেকেই বগুড়ার দইয়ের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। জনশ্রুতি আছে, এক সময় নেপালের রাজ পরিবারে নিয়মিত দই যেত। তাসখন্দে ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত বৈঠকে কর্তাদের ভোজনের সঙ্গে বগুড়ার দই পরিবেশন করা হয়েছিল। ইতিহাস থেকে জানা যায়, বগুড়ার নওয়াব ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীর বাড়িতে এসেছিলেন ইংরেজ লর্ড সার্জন এন্ডারসন। বগুড়ার দই খেয়ে তিনি একে অমৃতের সংঙ্গে তুলনা করেছিলেন। এন্ডারসনই ছিলেন প্রথম বিলেতি যিনি বগুড়ার দই খেয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন , দুধের এ রকম প্রিপারেশন তিনি আগে কখনও খাননি। ভারতীয় উপমহাদেশে এক সময় বগুড়ার দইয়ের জনপ্রিয়তা ছিল রুপকথার মতো। এ ছাড়াও এর অতীত সুখ্যাতি ছড়িয়ে রয়েছে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়াসহ ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে। তৎকালীন সময় বগুড়ার দইকে জনপ্রিয় করে তোলার পিছনে নওয়াব পরিবারের অবদান ছিল উল্লেখ করার মতো। একইভাবে উন্নতমানের দই উৎপাদনের সুখ্যাতির জন্য শেরপুর উপজেলার ঘোষ পরিবারের কারিগরদেরও যথেষ্ট অবদান রয়েছে। বর্তমানে বগুড়ার দই বগুড়া শহর ছাড়াও শেরপুরের অনেক প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যায়। দীর্ঘদিন যাবত এই পেশার সহিত জরিত সংশ্লিষ্টদের সহিত বগুড়া দইয়ের সুস্বাদুতা, সুনাম ও সুখ্যাতি সম্পর্কিত প্রশ্ন করা হলে তারা জানান বগুড়ার মাটি ও পানি উন্নতমানের দইয়ের জন্য খুবই উপযোগী। অধিক ননী সমৃদ্ধ দেশী গরুর দুধ দইয়ের স্বাদকে বাড়িয়ে দেয় এবং তাদের নিজস্ব কিছু কলাকৌশলও উন্নতমানের দই তৈরিতে সহায়ক।

খাদ্য হিসাবে দইয়ের গুরুত্ব

- দইয়ের পুষ্টিমান দুধের চেয়েও সমৃদ্ধ। খাঁটি দুধে তৈরি দইয়ে প্রায় ৫-৮ শতাংশ দুগ্ধ চর্বি, ৩.২-৩.৮ শতাংশ দুগ্ধ প্রোটিন, ৮.৬-৫.২ দুগ্ধ শর্করা (Lactose) বিদ্যমান। (সুকুমার দে-১৯৮০)।
- দধি ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অতি উত্তম উৎস।
- দুধের চেয়ে দধি বেশী রুচিকর এবং সুস্বাদু ফলে দুধ হজম করতে পারেনা এমন ব্যক্তিরা অনায়াসেই দধি হজম করতে পারে।
- বিভিন্ন ধরনের আন্ত্রিক জটিলতায় বিশেষ করে ডায়রিয়া, আমাশয়, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি রোগ নিরাময়ে দধি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
- দধি গ্রহণের ফলে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা হ্রাস পায় যার কারণে হৃদরোগের ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায় ডেইরী ইন্ডাস্ট্রিজ ইন্টারন্যাশনাল, সেপ্টেম্বর.১৯৯১)।
- দধি গ্রহণের ফলে শরীরে আর্সেনিক দূষণের মাত্রা অনেকাংশে কমিয়ে দিতে পারে (বাংলাদেশ অবজারভার. আগষ্ট,১৯৯৭)।

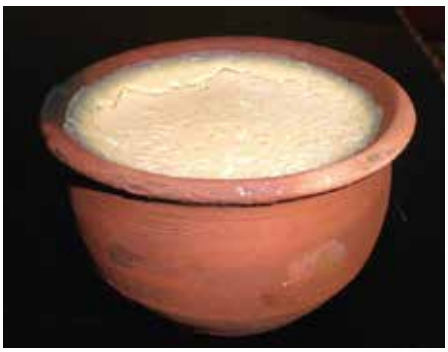

দধি

বগুড়ার দধি তৈরীর প্রয়োজনীয় উপকরণ

১) সতেজ দুধ	১১) বালতি
২) চিনি	১২) প্লাস্টিকের মগ
৩) পানি	১৩) দুধ পরিমাপক স্কেল
৪) খাবার সোডা	১৪) লোহার তৈরী সাঁড়াশি
৫) পুরাতন দধি বীজ	১৫) বাঁশের চাঁটাই দিয়ে তৈরী ছাপি/ছাতা
৬) লোহার তৈরী ড্রাম বা কড়াই	১৬) মাটির পাত্র বা সরা
৭) খুনতা	১৭) দুধ ছাঁকার পরিষ্কার পাতলা কাপড়
৮) ডাবু হাতল	১৮) খড় বা পাটের তৈরী বিড়া
৯) চা চামচ	১৯) চুলা
১০) এ্যালুমিনিয়াম গামলা বা ডিশ	২০) জ্বালানী (তেতুঁল কাঠ)

দুধের অর্গানোলেপ্টিক পরীক্ষা: দধি তৈরীর প্রয়োজনীয় পরিমাণ দুধ ক্রয়ের জন্য প্রথমে অর্গানোলেপ্টিক পরীক্ষা এবং ল্যাকটোমিটার দ্বারা দুধে পানি মিশানো আছে কি-না তা পরীক্ষা করা হয়। দুধের রং,গন্ধ,স্বাদ ইত্যাদি পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারা পরীক্ষা করাকে অর্গানোলেপ্টিক পরীক্ষা বলা হয়। অর্গানোলেপ্টিক পরীক্ষা এবং ল্যাকটোমিটার রিডিং মান দ্বারা দুধের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। তবে ল্যাকটোমিটার ছাড়াও এ পেশায় অভিজ্ঞজনেরা দুধে হাতের আঙ্গুল চুবিয়ে দুধের অবস্থা দেখে দুধের গুনাবলী অর্থ্যাৎ দুধ ভাল না খারাপ, দুধের পানি যোগ করেছে কিনা তা নির্ধারণ করতে পারেন।

দুধ জ্বাল দেওয়া: ১২০-১৩০ লিঃ দুধ ধরে এমন একটি পাত্রে (লোহার কড়াই) প্রথমে ১০ লিঃ পরিমান পানি নিয়ে চুলাতে ৩০ মিনিট সময় ফুটানো হয়। দুধের পরিমান কম বা বেশী হলে পানির পরিমান কম বা বেশী হবে। সাধারণতঃ ৪০ লিঃ দুধে ৩.০-৩.৫ লিঃ পানি প্রয়োজন। এরপর ১২০ লিঃ দুধকে তিন ধাপে অর্থ্যাৎ ৪০ লিঃ করে একটি পরিষ্কার পাতলা কাপড়ে ছেঁকে পাত্রের ফুটানো পানিতে যোগ করা হয় এবং সেই সাথে তেঁতুল কাঠ দিয়ে জ্বাল দেয়া হয় (তেতুঁল কাঠ জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করার কারণ হলো এই কাঠ ধীরে ধীরে জ্বলে এবং তুলনামূলকভাবে তাপ উৎপন্ন হয় বেশী এবং তাপ সমভাবে হয়)। দুধ যাতে পুড়ে পাত্রের তলাতে লেগে না যায় সেই জন্য খুনতা হাতা দিয়ে কিছুক্ষণ পর পর (১-২ মিনিট) দুধকে ভালভাবে নাড়াচাড়া করা হয়। দুধ ফুটলে প্রতি মণ দুধের জন্য ২৫-৩০ গ্রাম হিসাবে ৭৫-৯০ গ্রাম খাবার সোডা যা সোডিয়াম বাই-কার্বোনেট যোগ করা হয়। খাবার সোডা যোগ করার কারণে দধিতে খয়েরী রং এর সৃষ্টি হয়। দুধ উথলিয়ে এবং পাশাপাশি পাত্রের তলায় যাতে পুড়ে না যায় সেই কারণে সব সময় দু'ধরনের নাড়ানি দিয়ে নাড়া হয়। সাধারণ ভাষায় এ নাড়ানিগুলোকে ডাবু হাতা এবং খুনতা হাতা বলা হয়।

দধি বীজ (Culture) তৈরীকরণ: ২.০-২.৩০ ঘন্টা জ্বাল হওয়ার পর ০.৫ লিঃ পরিমাণ দুধ ড্রাম বা কড়াই থেকে তুলে একটি এ্যালুমিনিয়াম পাত্রে (গামলা) রাখা হয়। অত:পর ১৫-২০ মিনিট পর এই দুধের তাপমাত্রা যখন ঈষদুষ্ণ অবস্থায় আসে তখন ১ দিন আগের তৈরী মিষ্টি দধির পাত্র থেকে চা-চামচের সাহায্যে দধির উপরের অংশ (মাথা) আলতো করে তুলে ফেলে দেওয়া হয়। এরপর দধির (বীজ দধি) ভিতরের অংশ থেকে মটর বা কলাই এর দানার সমপরিমান চামচ দিয়ে কেটে বাম হাতের

তালুতে রেখে এ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে রক্ষিত প্রক্রিয়াজাত দুধ থেকে ২-৩ ফোঁটা দুধ নিয়ে ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে দধি বীজ ও প্রক্রিয়াজাত দুধ ভালভাবে মিশানো হয়। এই মিশ্রণে আরো ৬-৭ ফোঁটা পরিমাণ দুধ নিয়ে উত্তমরূপে মিশানোর পর এ্যালুমিনিয়াম পাত্রের রক্ষিত দুধে যোগ করে ভালভাবে নেড়ে মিশানো হয়। দধি বীজ মিশ্রিত দুধের পাত্রকে(এ্যালুমিনিয়াম পাত্র) চুলার পাশে ৩-৪ ঘন্টা রাখা হয় যাতে বীজ মিশ্রিত দুধ ঈষদুষ্ণ অবস্থায় থাকে। অত:পর বীজ মিশ্রিত দুধ ঠান্ডা জায়গায় রাখা হয়।

জ্বাল করা দুধে চিনি যোগকরণ: ড্রাম বা কড়াই এর দুধকে প্রায় ৪-৫ ঘন্টা ধীরে ধীরে জ্বাল দেওয়া হয়। দুধ শুকিয়ে যখন ৯০ লিঃ পরিমাণ হয় অর্থ্যাৎ প্রতি মণ দুধ থেকে ১০ লিঃ পরিমাণ দুধ শুকিয়ে যাবে (পমিমাপক স্কেল বা কাঠি দিয়ে জ্বাল করা দুধের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়) এই অবস্থায় প্রতি মণ (৪০ লিঃ) দুধের জন্য ৮ কেজি হিসাবে সর্বমোট ২৪ কেজি পরিমাণ চিনি যোগ করা হয়। চিনি যোগ করা দুধকে ২০ মিনিট সময় জ্বাল দিয়ে ফুটানো হয়।

দুধ ছাঁকা এবং পৃথকীকরণ: দুধে চিনি যোগ করে ফুটানোর পর দুধ চুলা থেকে নামিয়ে পরিষ্কার পাতলা কাপড় দ্বারা ছাঁকা হয়। পুনরায় দুধকে ছাঁকার কারণ চিনির ময়লা অপসারণ করা। এই দুধকে দুই ভাগে ভাগ করে প্রথম ভাগে ২০ কেজি পরিমাণ দুধ

একটি বালতিতে রেখে ঠান্ডা করা হয়। দ্বিতীয় ভাগে অবশিষ্ট ৭০ কেজি দুধ রাখা হয়।

দধি পাত্র প্রক্রিয়াজাত কৌশল: দধির পাত্রগুলোকে (১ লিঃ বা ২ লিঃ ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন মাটির পাত্র) গরম করার জন্য ৩০-৬০ মিনিট সময় পর্যন্ত চুলার ভিতরের জ্বলন্ত কয়লাতে রাখা হয়। ৩০-৬০ মিনিট পর লোহার সাঁড়াশি দিয়ে পাত্রগুলো চুলা থেকে তুলে উত্তপ্ত অবস্থায়ই শুকনো নরম সুতি কাপড় দিয়ে বিড়া বা মোচাতে বসিয়ে বালতিতে রাখা দ্বিতীয় ভাগের গরম ঘন দুধ ঢেলে পাত্র পরিপূর্ণ করে দেওয়া হয়। এভাবে পাত্রগুলোতে দুধ ঢেলে চুলার চারপাশে বসানো হয়। যেহেতু দধি পাত্রগুলো উত্তপ্ত অবস্থায় থাকে সেহেতু পাত্রে গরম দুধ ঢেলে দেওয়ার সময় দুধ ফুটে ফেনার সৃষ্টি করে। দুধ ফুটে ফেনা তৈরী হওয়ার কারণে দধির মাথা তৈরী হয় এজন্য বগুড়ার দধিকে অনেক সময় ছ্যাকা দেয়া দই নামে অভিহিত করা হয়। চুলাতে কয়লার জ্বলন্ত আগুন দেওয়া থাকে যাতে চুলার চারপাশের দধির পাত্রগুলো গরম থাকে।

দধি তৈরির ছাঁপির ব্যবহার: দধি পাত্রগুলো এক ধরনের ছাঁপি দ্বারা ঢেকে দেওয়া হয়। ছাঁপি বা মাথাল দেখতে অনেকটা ছাতার মতো যা স্থানীয়ভাবে বাঁশের চাটাই দিয়ে তৈরি করা হয় এবং চাটাই এর উপর মোটা কাগজ আঠা দিয়ে লাগানো থাকে। দধির পাত্রগুলো ছাঁপি দিয়ে ঢেকে দেওয়ার কারণে ছাপির ভিতরে এবং বাহিরে বাতাস আসা যাওয়া করতে পারে না ফলে ছাপির ভিতরে সব সময় গরমবস্থা বিরাজ করে যা দধি তৈরির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দধি পাত্রগুলো ছাপি দিয়ে ঢাকার ১-২ ঘন্টা পর ছাপি উঠানো হয়। এরপর গরমের দিনে আনুমানিক ১ ঘন্টা এবং শীতের সময় প্রায় ৩০ মিনিট দুধ পূর্ণ পাত্র গুলোকে পাত্রের দুধ ঈষদুষ্ণ অবস্থায় আসে।

দধি বীজ যোগকরণ ও দধি তৈরি: এই পর্যায়ে প্রথম ভাগের বালতিতে রাখা ২০ লিঃ ঠান্ডা দুধে পূর্বে তৈরীকৃত ১/২ কেজি বীজ মিশ্রিত দুধ যোগ করে ভালভাবে নাড়াচাড়া করার পর প্রত্যেক পাত্রে যোগ করা হয় যাতে পাত্র গুলো পরিপূর্ণ হয়। এই সময় চুলার গরম অবস্থা পরীক্ষা করা হয় এবং গরম বেশী হলে কিছু কয়লা তুলে রাখা হয়। পুনর্বার ছাঁপি দিয়ে পাত্র গুলোকে ঢেকে দেয়া হয়। ঢেকে দেয়ার ২ ঘন্টা পর দ্বিতীয় বারের মত ছাঁপি উঠানো হয় এবং চুলার নিকটবর্তী পাত্র গুলোকে পিছনে এবং পিছনের পাত্রগুলোকে সামনে আনা হয়। এই সময় পাত্রগুলোকে দ্বিতীয় বারের মত প্রথম ভাগের বালতিতে রাখা হয় অবশিষ্ট বীজ মিশ্রিত দুধ যোগ করে ছাঁপি দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। ঢেকে দেয়ার ৫ ঘন্টা পর তৃতীয় বার ছাঁপি উঠানো হয় এবং সেই সাথে পাত্র নাড়াচাড়া করে দেখা হয় দধি জমেছে কি-না। দধি ভালমত না জমলে পুনরায় পিছনের পাত্রগুলোকে চুলার নিকটবর্তী অবস্থানে এবং নিকটবর্তী পাত্রগুলো পিছনে নেওয়া হয় এবং সেই সাথে সামান্য কয়লার আগুন চুলাতে দিয়ে ছাঁপি দ্বারা ঢেকে দেয়া হয়। পরিশেষে এক থেকে দেড় ঘন্টা পর ছাঁপি উঠিয়ে পাত্রগুলোকে চুলার পাশ থেকে নিয়ে ঠান্ডা জায়গায় রাখা হয়। দধি ঠান্ডা হলে ভোক্তার নিকট বিক্রয় করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় দধি জমাট বাঁধতে ৬-৮ ঘন্টা সময় লাগে। দধি প্রস্তুতের জন্য দুধ জ্বাল থেকে শুরু করে দধি প্রস্তুত হতে শেষ পর্যন্ত সময় লাগে প্রায় ১৬ ঘন্টা।

দধি উৎপাদন: দধি উৎপাদনের পরিমাণ নির্ভর করে তরল দুধ কত সময় তাপ দেয়া হবে বা দুধ জ্বাল দিয়ে কি পরিমাণ শুকানো হয়েছে তার উপর। সাধারণত এই প্রক্রিয়ায় প্রতি ৪০ লিঃ দুধ থেকে প্রায় ৩৫ কেজি দধি উৎপাদিত হয়ে থাকে। সেই হিসাবে ৩ মণ দুধ থেকে প্রায় ১০৫ কেজি দধি তৈরি হবে। বগুড়ার দধি সাধারণত: ১ কেজি এবং ২ কেজি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন পাত্রে তৈরি করা হয় এছাড়াও ১০০ গ্রাম ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন মাটির গ্লাসে দধি তৈরি হয়ে থাকে।

দধি তৈরিতে জ্বালানী: প্রতি ৪০ কেজি দুধ জ্বাল দিয়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণ দুধ শুকিয়ে দধি তৈরিতে প্রায় ৩০ কেজি তেঁতুল কাঠ প্রয়োজন। বগুড়ার দধি উৎপাদনকারী সকলেই সাধারণত তেঁতুল কাঠ দিয়ে দধি উৎপাদন করে কারণ তেঁতুল কাঠ সমভাবে তাপ উৎপন্ন করে, ধীরে ধীরে একইভাবে জ্বলে এবং সর্বোপরি কোনরূপ ধোঁয়ার সৃষ্টি হয় না। ফলস্বরূপ দধি ধোঁয়াটে গন্ধ হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

দধির সংরক্ষণকাল ও বিপণন: দধিকে খুব বেশী দিন ভাল অবস্থায় রাখা যায় না। দধি বা এরূপ গাঁজানো দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি ধীরে ধীরে টক হতে থাকে। সাধারণভাবে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে বগুড়ার দধি ২-৩ দিন গড়ে ৬০ ঘন্টা এবং শীতকালে ৩-৪ দিন গড়ে ৮৪ ঘন্টা পর্যন্ত সতেজ ও খাওয়ার উপযুক্ত থাকে। লক্ষণীয় প্রত্যেক বিক্রেতাই দধিকে ১ দিন পর রেফ্রিজারেটরে রেখে বিক্রি করেন। জনপ্রিয়তা এবং স্বাদের বিচারে বগুড়া শেরপুরের দধি অতুলনীয় যার কারণে উৎপাদনকারীরা স্থানীয়ভাবে বিক্রি ছাড়াও ঢাকাসহ বগুড়ার আশেপাশের অঞ্চল বিশেষ করে সিরাজগঞ্জ, রংপুর, নাটোর এলাকায় সরবরাহ করে থাকেন।

বগুড়ার দধির বৈশিষ্ট্য: বগুড়ার দধি দেখতে অনেকটা খয়েরী রং এর ন্যায়। দেখতে কোমল মসৃণ গঠনের, দধির মাথাতে দুগ্ধননীর স্তর থাকে এবং সেই সাথে আকর্ষণীয় গন্ধ ও মৃদু অম্লীয় স্বাদ যুক্ত। দধির বুনন নরম এবং দৃঢ়। এই দধির আরেকটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য দধি পূর্ণ পাত্রের মাথা উল্টালেও দই উপচিয়ে পড়ে না।

দেশীয় পদ্ধতিতে পনির উৎপাদন প্রযুক্তি

পটভূমি:

দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির মধ্যে পনিরের প্রকারভেদ এত বেশী যে অন্যান্য দ্রব্যের এত প্রকারভেদ নেই। যতটুকু জানা যায় তাতে প্রায় দুই হাজার রকমের পনির বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রচলিত আছে তবে উহাদের স্বাদের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই। পনির প্রস্তুতের বিভিন্ন দেশের ইতিহাস থেকে যতটুকু জানা যায় তা হলো আরব দেশ সমূহে, মিশর, ভারতীয় উপমহাদেশ এবং গ্রীসে প্রথম পনিরের প্রচলন শুরু হয়। পনির ঐ সমস্ত জাতির অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। পনির দুগ্ধজাত পণ্যের মধ্যে একটি অন্যতম পণ্য যা দুগ্ধ জমাট এনজাইম রেনিন দুধে যোগ করে তৈরি করা হয়। আমাদের দেশীয় পনির মূলত কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে যা আন্তর্জাতিকভাবে ঢাকা পনির নামে পরিচিত। আকৃতি প্রতিবন্ধ এবং অম্লপক্ক প্রণালীর উপর ভিত্তি করে আমাদের দেশীয় পনিরকে আংশিক কঠিন বা কঠিন পনিরের শ্রেণী বিন্যাসে ফেলা হয়। পনির দুগ্ধ আমিষ জাতীয় খাদ্যের অতি উত্তম উৎস যা শরীরের বিশেষ করে শিশু কিশোর ও বৃদ্ধদের আমিষ পুষ্টি চাহিদার উল্লেখযোগ্য ভাবে মিটানো যায়। এজন্য পনিরকে অনেক সময় দুগ্ধ মাংস (Milk meat হিসাবে অভিহিত করা হয়। এ ছাড়াও পনিরে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ভিটামিন রয়েছে।

পনির তৈরির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি: অষ্টগ্রাম সাদা পনিরের জন্য বিখ্যাত। এর খ্যাতি সুদুর ইংল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ধারণা করা হয় ৩০০-৫০০ বৎসর আগে এখানে পনির উৎপাদন শুরু হয়। এই জনপদে সাধারণ মানুষের হাতে উৎকৃষ্ট পনির উৎপাদন কিভাবে শুরু হয়েছে তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। সম্ভবত পাঠান, মোঘল কিংবা দত্ত বংশীয় অভিজাত মানুষের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে পনিরের উৎপাদন প্রণালী এদেশে আসে এবং ধারণা করা হয় যে, পনিরের জনপ্রিয়তাও অষ্টগ্রামকে কেন্দ্র করেই সৃষ্ট হয়েছে এবং ধীরে ধীরে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েছে। অষ্টগ্রামের হাওর এলাকায় প্রচুর ঘাস হত। ঘাস আবৃত অনেক জমি অনাবাদি থাকত। অষ্টগ্রামসহ আশেপাশের এলাকা নরসিংদী, গাজীপুর, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রভৃতি অঞ্চল থেকে প্রচুর গরু মহিষের পাল এ লোভনীয় ঘাস আবৃত চারণ ভূমিতে চারণের জন্য নিয়ে আসা হত। এই ঘাসের মধ্যে স্থানীয় ভাষায় "চাইল্যা ঘাস" অত্যন্ত প্রোটিন সমৃদ্ধ-সে ঘাস দুগ্ধ উৎপাদনের জন্যও খুব সহায়ক। বৃদ্ধদের মধ্যে অনেকেই বলেন মহিষের এত দুধ হত যে, এই দুধ বাজারে বিক্রি হত না ফেলে দিতে হত। যোগাযোগ ব্যবস্থার চরম দুরাবস্থার জন্য দুধ বাইরে পাঠানো যেত না। সম্ভবত এই বিষয়টি স্থানীয় খামারীদেরকে পনির উৎপাদনের কৌশল উৎপাদনের সহায়তা করেছিল। দুধের চেয়ে দুধের তৈরি পনির অনেক বেশী দিন সংরক্ষণ করা যায়। পূর্বে শুধু মহিষের দুধ থেকে পনির হত। গরুর দুধে পনির হয় এটা কেউ কল্পনাও করেনি। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং নতুন চাষাবাদ প্রক্রিয়া শস্য কৃষি ক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচনা করে। তারই ধারাবাহিকতায় ক্রমান্বয়ে অনাবাদি তৃণভূমি কমে যাওয়ায় মহিষের সংখ্যাও হ্রাস পায়। ফলে বর্তমানে গরুর দুধেই পনির তৈরি করা হয়। বর্তমানে যান্ত্রিক চাষাবাদের ফলে এবং ঘরে যন্ত্রচালিত মাড়াই কলের ব্যবহার কমে যাওয়ায় মহিষের কদর কমে গেছে। একদিকে ঘাসের দুষ্প্রাপ্যতা অন্যদিকে যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় চাষাবাদ গো-মহিষের জন্য টিকে থাকা অনেকটা প্রতিকূল হয়ে উঠেছে। ফলে আগের মত ব্যাপক পরিমাণে পনির উৎপাদন হয় না। এছাড়া বর্ষাকালে এই অঞ্চলে পনির উৎপাদন খুব একটা হয় না বললেই চলে কারণ এই সময় এই অঞ্চলের চারিদিকে পানিতে প্লাবিত থাকে। সবুজ ঘাস ও খাদ্যের অভাবে কৃষকেরা সস্তা দামে গো-মহিষ বিক্রি করে দেন। দুধের দাম থাকে অত্যন্ত বেশী। এই সময় পনির উৎপাদকরা

অষ্টগ্রাম থেকে অন্যত্র (যেখানে দুধের দাম কম) চলে গিয়ে পনির উৎপাদন ও বিক্রি করে থাকে। (সূত্র: অষ্টগ্রামের ইতিহাস ঐতিহ্য, আবুল কাসেম)

অষ্টগ্রাম পনির তৈরির কৌশল

পনির তৈরির উপকরণ: গরু, মহিষ বা ছাগলের দুধ, মাওয়ার (প্রক্রিয়াজাত পাকস্থলী) পানি, এ্যালুমিনিয়াম পাত্র (৫০ লিঃ), স্টেইনলেস স্টীলের ধারালো ছুরি, বাশেঁর তৈরি ছুরি, বাশেঁর তৈরি টুকরি বা ঝুড়ি, লবণ এবং ছিদ্র করার জন্য চোখা কাঠি (পরিধি প্রায় ২.৫-৩ সেঃমিঃ)।

মাওয়া তৈরির পদ্ধতি: স্থানীয়ভাবে মাওয়া হলো লবণ দ্বারা বিশেষভাবে প্রক্রিয়াকৃত গরু, ছাগল/বাছুরের পাকস্থলী যা রোদে শুকিয়ে তৈরি করা হয়। গরু/ছাগলের পাকস্থলী চারটি অংশে বিভক্ত যথাঃ রুমেন, রেটিকুলাম, ওমেসাম ও অ্যাবোমেসাম বা প্রকৃত পাকস্থলী (পাকস্থলীর শেষাংশ)। এই অ্যাবোমেসাম বা প্রকৃত পাকস্থলী দিয়েই মাওয়া তৈরি করা হয়। বাহ্যিকভাবে

পনির

যা দেখতে অনেকটা বাংলা সংখ্যা "৫" এর মতো। পনির উৎপাদনকারীরা স্থানীয় কসাইখানা হতে বাড়ন্ত গরুর এই পাকস্থলী ২০-৩০ টাকা দরে ক্রয় করে থাকেন। মাওয়া তৈরির জন্য প্রথমে পাকস্থলীর ভিতরে বর্জ্য অপসারণ করা হয়। এ জন্য ধারালো চাকু দিয়ে পাকস্থলী কেটে টিউবওয়েলের পানি দিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ধৌত করতে হয় যাতে করে পাকস্থলীর ভিতরে পিচ্ছিল (মিউকাস) অংশ পানির সাথে ধুয়ে যেতে না পারে। এবার বাঁশের তৈরি চাটাই এর উপর পাকস্থলী এমনভাবে বিছানো হয় যাতে পাকস্থলীর ভিতরের অংশ ভিতরে থাকে। অতপর ২৫০-৫০০ গ্রাম পরিমাণ খাদ্য লবণ পাকস্থলীর উপরের অংশে সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হয়। এভাবে পাকস্থলী ৩-৪ দিন রোদে শুকিয়ে টুকরা টুকরা করে কেটে মাওয়া তৈরি করা হয়। মাওয়াকে সাধারণত ঠান্ডা জায়গায় যে কোন পাত্রে রেখে প্রায় ৩০ দিন পর্যন্ত ভালোভাবে সংরক্ষণ করা যায়।

পনিরের জন্য মাওয়ার পানি প্রস্তুতকরণ (৪০ কেজি দুধের হিসাবে): গ্রীষ্মকালে একটি গরুর প্রক্রিয়াকৃত প্রকৃত পাকস্থলী বা মাওয়ার ১/৪ অংশ বা ২৫ শতাংশ এবং শীতকালে ১/৩ অংশ বা ৩৩ শতাংশ পরিমাণ মাওয়া একটি পাত্রে নিয়ে তাতে ২-৩ কেজি পরিমাণ পানি ও ১ কেজি পরিমাণ কাঁচা দুধ মিশিয়ে ২৪ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখা হয়। ব্যবহারের পূর্বে মাওয়ার টুকরোগুলো দুধ এবং পানির দ্রবণে ভালভাবে মিশ্রিত করা হয়। মাওয়ার পানি সঠিকভাবে প্রস্তুত হয়েছে কিনা তা পরীক্ষার জন্য বাম হাতের তালুতে কিছু পরিমাণ (৫ মিঃলিঃ) দুধ নিয়ে এতে ২ ফোঁটা মাওয়ার পানি যোগ করে দেখতে হবে দুধ ১০ মিনিটের মধ্যে জমাট বাঁধে কিনা? যদি না বাঁধে তবে মাওয়ার টুকরাগুলোকে পুনরায় হাত দিয়ে ভালভাবে কচলিয়ে প্রায় ৩০ মিনিট সময় ভিজিয়ে রাখা হয়। পনির তৈরির পূর্বে মাওয়ার পানি অবশ্যই পাতলা পরিষ্কার কাপড়ে ছেঁকে নিতে হবে। স্থানীয় ভাষায় এই পানিই মাওয়ার পানি নামে পরিচিত।

যেভাবে পনির তৈরি করা হয়-

- প্রায় ৩-৪ ঘন্টা পূর্বেও দোহনকৃত ৪০ কেজি পরিমাণ কাঁচা দুধ পরিষ্কার পাতলা কাপড়ে ছেঁকে একটি এ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে নিতে হবে। ২-৩ কেজি পরিমাণ মাওয়ার পানি ধীরে ধীরে যোগ করতে হবে এবং ভালভাবে নাড়তে হবে। দুধ জমাট বাঁধার জন্য ১০-৩০ মিনিট সময় স্থিরভাবে রেখে দিতে হবে। দুধ জমাট হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করার জন্য বাঁশের তৈরি পাতলা ছুরি প্রবেশ করিয়ে দেখতে হবে। যদি ছুরিটি সোজা অবস্থায় দন্ডায়মান থাকে তবে বুঝতে হবে দুধ সঠিক ভাবে জমাট হয়েছে।
- জমাট বাঁধার ১০ মিনিট পর বাঁশের তৈরি ছুরি দ্বারা জমাট দুধকে আড়াআড়িভাবে কেটে দিতে হয়।
- কাটার ফলে কর্তিত জায়গা থেকে নীলাভ বর্ণের পানি বের হয়ে আসলে এর ১০ মিনিট পর কর্তিত জমাট দুধকে হাত দিয়ে আলতোভাবে ভেঙ্গে দিতে হয়।
- ছানাকে উত্তমরূপে থিতানোর জন্য ৫-১০ মিনিট সময় রেখে দুই হাত দিয়ে চাপ প্রয়োগ করে খুব ধীরে ধীরে পাত্রের একপার্শ্বে জমা করতে হয়। এমন ভাবে চাপ প্রয়োগ করা হয় যাতে ছানার ভিতর খুব বেশী পানি না থাকে এবং চাপা (কমপ্যাক্ট ম্যাশ) অবস্থায় থাকে।
- এবার ছানাকে স্টেইনলেস স্টিলের ধারালো ছুরি দ্বারা টুকরো টুকরো (Thin slices) করে কাটা হয়।
- অতপর ছানার টুকরা বাঁশের তৈরি ঝুড়িতে (প্রতিটি ঝুড়ির ব্যাস হবে প্রায় ১৬ সেমি. এবং উচ্চতা হবে প্রায় ৬-৭ সেমি.) হাত দ্বারা ঠেসে ভরতে হবে। ৪০ কেজি দুধের ছানা দিয়ে ৫ টি ঝুড়ি (প্রতিটি ঝুড়িতের পনিরের ওজন হবে ১ কেজি) পূর্ণ করা সম্ভব।
- নির্দিষ্ট আকার আকৃতির (ঝুড়ির ছাপ) জন্য ১৫ মিনিট পর ঝুড়ির ছানাপিন্ডকে প্রথম উল্টিয়ে দিতে হয়।
- পানি নিষ্কাশনের জন্য ছানার পিন্ডসহ ঝুড়ি একটি পাত্রে প্রায় ১৫ ঘন্টা রাখতে হবে এবং সেই সাথে ঝুড়িটি অন্য একটি পাত্র দ্বারা ঢেকে রাখতে হবে, যাতে বাহিরের ময়লা বা পোকামাকড় না পড়ে।

পনিরে লবণ দেয়াঃ পনের (১৫) ঘন্টা পর ঝুড়ির পনির পিন্ডকে দ্বিতীয়বার উল্টিয়ে চোখা (পয়েন্টেড) কাঠি দ্বারা (ব্যাস প্রায় ২.৫-৩ সেমি.) পনির পিন্ডের কেন্দ্র বা মাঝ বরাবর তিনটি ছিদ্র করে (ত্রিভুজাকৃতির) ৫০ গ্রাম খাবার লবণ ঢুকিয়ে দিতে হয়। অবশিষ্ট পরিমাণ লবণ পনির পিন্ডের চারপাশে মেখে দিতে হবে। এতে করে লবণ ধীরে ধীরে সমস্ত পনির পিন্ডে বিস্তৃত হবে। এভাবে পনির পিন্ডকে পূর্বের পাত্রে ৩ দিন পর্যন্ত রাখতে হবে।পনিরে লবণ যোগ করার কারণ-

- লবণ পনির পিন্ড ছানা হতে ছানার পানি চুষে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনে সহায়তা করে ফলে পনিরের অম্লতা এবং

জলীয় অংশ নিয়ন্ত্রিত হয়।

- অবাঞ্ছিত ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি রোধ করে।
- পনিরের সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি করে।

পনির প্যাকিং করা: পনিরে লবণ দেয়ার তিন দিন পর পার্চমেন্ট কাগজে প্যাকিং করে বিক্রি করা হয়। এছাড়া পনির যাতে বেশী শুকিয়ে না যায় এর জন্য সবসময় পরিষ্কার ভিজা কাপড় দিয়ে ভিজিয়ে রাখা হয়।

পনির উৎপাদন: গরুর দুধ- শীতকালে প্রতি ৮ কেজি দুধ থেকে ১ কেজি পনির (১ মণ দুধে ৫ কেজি পনির) এবং গ্রীষ্মকালে ৯ কেজি দুধ থেকে ১ কেজি পনির (১ মণ দুধে ৪.৫ কেজি পনির) উৎপাদিত হয়ে থাকে।

মহিষের দুধ- গড়ে প্রতি ৭ কেজি দুধ থেকে ১ কেজি অর্থাৎ প্রতি মণ দুধ থেকে প্রায় ৬ কেজি পনির উৎপাদিত হয়।

ছাগলের দুধ- প্রতি ৭.৫ কেজি ছাগলের দুধ থেকে প্রায় ১ কেজি পরিমাণ পনির তৈরি করা যায়।

পনির সংরক্ষণ: গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে স্বাভাবিক পরিবেশ/তাপমাত্রায় অষ্টগ্রাম পনিরকে ৭-১০ দিন এবং শীতকালে ১৫-২০ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। পনির বেশী দিন সংরক্ষণ করতে গেলে ২ দিন পর পর লবণ পানি দিয়ে ঘষে দিতে হবে। তবে কোন কোন প্রস্তুতকারক পনিরের সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি এবং বিশেষ আস্বাদের জন্য উন্মুক্ত আগুনের চুলার ধোঁয়ায়িত (স্মুকিং) করে থাকেন। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পনিরকে ১ মাস থেকে ২ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

ছানার পানির ব্যবহার: ৪০ কেজি দুধ থেকে পনির প্রস্তুত করলে পনিরের পাশাপাশি উপজাত (বাই-প্রোডাক্ট) হিসেবে প্রায় ৩৫-৩৬ লিঃ ছানার পানি পাওয়া যায়। এই ছানার পানি নিম্নোক্ত কাজে ব্যবহৃত হয়।

ক) মাওয়ার পানি তৈরিতে- শুধুমাত্র ২-৩ লিঃ পরিমাণ ছানার পানি একটি পাত্রে নিয়ে এতে পূর্বের ভিজানো (দুধ+পানিতে) পাকস্থলীর টুকরা যোগ করে ২৪ ঘন্টা রাখা হয়। ২৪ ঘন্টা পর পনির তৈরির সময় মিশ্রণকে ভালমত মিশিয়ে পরিষ্কার কাপড়ে ছেঁকে মাওয়ার পানি তৈরি করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় ভিজানো পাকস্থলীর টুকরাগুলোকে ৩ দিন পর্যন্ত ব্যবহার করে মাওয়ার পানি তৈরি করা হয়। ৩ দিন পর পূর্বে উল্লিখিত (পনির তৈরির জন্য মাওয়া প্রস্তুতকরণ অনুচ্ছেদ) পদ্ধতিতে নতুনভাবে মাওয়ার পানি তৈরি করতে হবে।

খ) মানুষের খাদ্য হিসেবে- মানুষের খাদ্য হিসেবে ছানার পানি প্রতি লিটার ১ টাকা দরে প্রত্যেক পনির প্রস্তুতকারকই বিক্রি করে থাকেন। তাদের মতে, ছানার পানি দিয়ে পান করলে খুব সুস্বাদু এবং মিষ্টি লাগে। এছাড়াও ছানার পানির ঔষুধি গুণও রয়েছে। কাঁচা ছানার পানি খেলে দীর্ঘদিন আমাশয়ে আক্রান্ত রোগীর আমাশয় নির্মূলে সহায়তা করে।

ভাল পনিরের বৈশিষ্ট্যঃ পনির ধারালো ছুরি দিয়ে কাটলে যদি পনিরের ভিতরে জালি জালি ভাব দেখা যায় তবে বুঝতে হবে পনির ভালো হয়েছে।

পনির শিল্পের বর্তমান প্রেক্ষাপট: অষ্টগ্রামের পনির প্রস্তুতকারকরা সাধারণত বৎসরের ৮ মাস পনির প্রস্তুত করে থাকেন। বর্ষাকালে এই অঞ্চলের চারিদিকে পানিতে তলিয়ে যায়। ঘাস ও খাদ্যের অভাবে কৃষকেরা সস্তা দামে গো-মহিষ বিক্রি করে দেয়। দুধের দাম থাকে অত্যন্ত বেশী (৩৫-৪০ টাকা/লিঃ)। এই সময় পনির উৎপাদনকারীরা অষ্টগ্রাম থেকে অন্যত্র (যেখানে দুধের দাম কিছুটা কম) চলে গিয়ে পনির উৎপাদন ও বিক্রি করে থাকে। অষ্টগ্রামে বর্তমানে যারা পনির তৈরি করে এদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। জরিপে দেখা যায় বর্তমানে অষ্টগ্রামে মাত্র ৬ (ছয়) জন খামারী পনির শিল্পের সহিত সরাসরি জড়িত। তারা বংশানুক্রমিকভাবে এই পেশার সহিত জড়িত। যদিও এই অঞ্চলের প্রায় ৫০ শতাংশ মানুষ কমবেশী পনির তৈরির কৌশল সম্পর্কে অবগত। যারা পনির তৈরি করেন তাদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। পনির থেকে তাদের বাৎসরিক আয়ও খুব বেশী নয় এবং পনির তৈরি এদের প্রত্যেকেরই মূল পেশা নয়, উপপেশা। গবেষণায় দেখা যায় যে, পনিরের আয়ে তাদের জীবিকা চলে না তাই তারা একমাত্র পেশা হিসাবে এটিকে গ্রহণ করতে পারেনি। প্রত্যেক উৎপাদনকারীদের কেউ কেউ ঘরে বসেই পনির বিক্রি করেন আবার কেউ কেউ ঢাকাতে সরবরাহ করে থাকেন। তাদের মতে উৎপাদন ও পরিবহন খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে ব্যাপকভাবে পনির উৎপাদন করে বাইরে সরবরাহ করতে পারছেন না।

উন্নত জাতের ঘাস পরিচিতি, চাষ পদ্ধতি (নেপিয়ার, পারা, ভূট্টা), উন্নত জাতের ঘাস প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ এবং ৫ টি গরুর জন্য সাইলেজের পরিমাণ নির্ণয়

বাংলাদেশের দুগ্ধ বা গরু মোটাতাজাকরণ খামারীদের নিকট গুণগতমান সম্পন্ন আঁশজাতীয় খাদ্য বিশেষ করে সবুজ ঘাস প্রাপ্যতা দিন দিন স্বপ্ন হয়ে দেখা দিচ্ছে। চাষযোগ্য জমির ক্রমবর্ধমান অপ্রাপ্যতা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে চারণভূমি লুপ্ত হওয়া ও আনুভূমিক এবং উল্লম্বাকারে দানা শস্যেও বর্ধিতহারে চাষ ইত্যাদি কারণে গবাদিপশুর জন্য সবুজ ঘাস চাষ প্রায় অসাধ্য হয়ে উঠছে। কিন্তু, দেশের আর্থ-সামাজিক ও কৃষি ব্যবস্থার যুগপৎ পরিবর্তনের ধারায় একজন কৃষক যখন সবুজ ঘাস উৎপাদন ও পণ্য হিসেবে বিক্রি অথবা গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে লাভজনকভাবে দুধ ও মাংস উৎপাদন করে নিজের আর্থিক অবস্থার উন্নতিতে বেশী সাচ্ছন্দবোধ করছেন তখন তিনি তার বাৎসরিক জমি ব্যবহার পরিকল্পনায় সবুজ ঘাস চাষকে স্থান দিচ্ছেন। বিষয়টি বাংলাদেশের সকল কৃষি অঞ্চলের জন্য সত্য হবে তা নয়; বরং কৃষি শস্যের আঞ্চলিক উপযোগীতাই এ বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

সবুজ উৎপাদনের পরিকল্পনার একজন কৃষক প্রথমেই বিবেচনায় রাখেন উচ্চ ফলনশীল ঘাসকে নেপিয়ার ঘাসটি এ কারণেই এশিয়া ও আফ্রিকার উন্নয়নশীল দেশ সমূহে বেশ সমাদ্রিত হয়েছে। নেপিয়ার ঘাসটি খামারীদের মাঝে সাধারণত কাটিং, চারা বা কান্ড রোপণের মাধ্যমে সম্প্রসারিত হয়েছে। এর ফলে পৃথিবীতে কত জাতের নেপিয়ার আছে তার সঠিক পরিসংখ্যান উল্লেখ করা মুশকিল।

আমাদের দেশে স্বাধীনতা পূর্বকাল হতে "নেপিয়ার বাজরা (হাইব্রীড) জাতের প্রচলন ছিল, এবং খামারী পর্যায়ে ঘাসটির আবাদ অঞ্চল ভেদে সীমিত আকারে ছিল।

নেপিয়ার বাজরা সহ অন্যান্য জাত সংগ্রহ ও উন্নয়নের কাজটি বাংলাদেশ প্রানিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট বা বিএলআরআই শুরু করে ১৯৯০ সালের দিকে। তৎপরবর্তীকালে কয়েক দফায় নেপিয়ার ঘাসের কয়েকটি জাত সংগ্রহীত, আঞ্চলিক আবহাওয়ায় চাষ, বাছাঁই ও উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান থাকে। উক্ত বাছাঁই ও উন্নয়ন কাজের ধারাবাহিকতায় বিএলআরআই নেপিয়ার-১, বিএলআরআই নেপিয়ার-২, বিএলআরআই নেপিয়ার-৩ এবং বিএলআরআই নেপিয়ার ৪ নামে উন্নয়ন করা হয়।

বিএলআরআই নেপিয়ার-১

বিএলআরআই নেপিয়ার-১

নেপিয়ার বাজরা বা হাইব্রিড নেপিয়ারের উন্নত এ্যাক্রেশনগুলো বাছাই করে বিএলআরআই নেপিয়ার-১ ঘাসটি তৈরী করা হয়েছে। প্রতি ঘাসের গোড়ায় কতগুলো এ্যাক্রেশন থাকবে বা নির্দিষ্ট বয়সে কত উচ্চতা হবে তা মাটি, পরিবেশ ও পরিচর্যার উপর নির্ভর করে। তবে বিএলআরআই কর্তৃক উন্নীত অন্য দু'টো জাত হতে ঘাসটির ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যগুলো হল ইহা আনুপাতিক হারে লম্বা কান্ডযুক্ত, প্রতি ছোপায় ৮-২০টি এ্যাক্রেশন থাকতে পারে, কান্ড ও পাতার ওজনের গড় অনুপাত ২ঃ৩ পরিণত বয়সে ফুল আসে এবং পাতায় ধূসর রং এর হুলগুলো তেমন ধারালো নয়। কান্ড বা পাতাগুলো আনুপাতিক হারে নরম। বাংলাদেশে প্রাপ্ত জাতটির সহিত বিএলআরআই নেপিয়ার-১ ঘাসটির মিল রয়েছে।

বিএলআরআই নেপিয়ার-২

বিএলআরআই নেপিয়ার-২

বিএলআরআই নেপিয়ার-২ ঘাসটি পূর্বের ন্যায় উদ্ভাবন করা হয়েছে। বিএলআরআই নেপিয়ার-১ ঘাসটি হতে এ ঘাসটির বৈশিষ্ট্যগত ভিন্নতা হল ইহার পাতার কিনারা ও অগ্রভাগ খুব ধারালো। মানুষের চামড়ায় ক্ষত সৃষ্টি করে, এবং পাতা বা কান্ডের গায়ের ধুসর রং এর হুলগুলো মানুষের চামড়ার ভিতর ঢুকে যায়। এ সব কারণে ঘাসটি খামারীদের নিকট কম গ্রহণযোগ্য। এ ছাড়া প্রতি ছোপায় এ্যাক্রেশন সংখ্যা, কান্ড ও পাতার ওজনের অনুপাত এবং উচ্চতা বিএলআরআই নেপিয়ার-১ এর মতই। তবে, ঘাসটিতে অন্যান্য জাত দ্বয়ের তুলনায় আগে ফুল আসে, এবং আনুপাতিক হাতে কান্ড ও পাতা অন্যান্য জাতের তুলনায় শক্ত।

বিএলআরআই নেপিয়ার-৩

বিএলআরআই কর্তৃক উন্নীত তিনটি নেপিয়ার ঘাসের মধ্যে খামারীদের নিকট সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য জাত হল বিএলআরআই নেপিয়ার-৩। অন্য দু'টো নেপিয়ার জাতের তুলনায় ঘাসটির উচ্চতা কম, প্রতি ছোপায় এ্যাক্রেশন সংখ্যা বেশী, কান্ড বা পাতায় হুলের সংখ্যা নেই বললেই চলে এবং বিদ্যমান হুলগুলো মানুষের চামড়ার জন্য মোটেই ক্ষতিকারক নয়। কান্ড ও পাতার ওজনের অনুপাত ১ঃ৪, আনুপাতিকহারে বেশী বয়সে ফুল ধরে।

বিএলআরআই নেপিয়ার-৩

বিএলআরআই কর্তৃক উন্নীত নেপিয়ার জাতগুলোর রাসয়নিক গঠন ও পুষ্টিমান

যে কোন ঘাসের উৎপাদন, রাসায়নিক গঠন ও পুষ্টিমান বিভিন্ন কারণে পরিবর্তন হয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো হচ্ছে ঘাসের বয়স, পরিচর্যা, মাটির গুণাগুণ ও জাতের পার্থক্য। নীচে বিএলআরআই কর্তৃক উন্নীত নেপিয়ার ঘাসের তিনটি জাতের আনুপাতিক উৎপাদন, রাসায়নিক গঠন ও পুষ্টিমান উপস্থাপন করা হল।

টেবিল-১: বিএলআরআই কর্তৃক উন্নীত বিভিন্ন জাতের নেপিয়ার ঘাসের আনুপাতিক উৎপাদন, রাসায়নিক গঠন ও পুষ্টিমান (৫০ দিন বয়সে)

বৈশিষ্ট্যাবলী	বিএলআরআই নেপিয়ার ১	বিএলআরআই নেপিয়ার ২	বিএলআরআই নেপিয়ার ৩
ক) রাসায়নিক গঠন			
ঘাস উৎপাদন, টন (প্রতি হেক্টর প্রতি বছরে)	১২০-১৫০	১২০-১৬০	১২০-১৬০
ঘাসে জলীয়াংশের পরিমাণ (কিলো/১০০ কিলো)	৭৫-৮০	৭৫-৮০	৭৫-৮০
আমিষ (কিলো/১০০ কিলো) আঁশের পরিমাণ (এডিএফ, কিলো/ ১০০ কিলো)	১.১৫-১.২০ ১০.২-১০.৫	১.২০-১.২৫ ৯.৫-১০.৫	১.৮০-২.০ ৯.৫-১০.৫
খ) পুষ্টিমান			
প্রতি ১০০ কিলো গরুর ওজনের জন্য দৈনিক গ্রহণ (কিলো)	৮.০-৮.৫০	৬.০-৭.০	৭.০-৮.০
ঘাসের পাচ্যতা (কিলো/১০০ কিলো) পাকস্থলীতে পাচ্যতা (কিলো/১০০ কিলো)	৪৯.০-৫০.০ ৩৫.০-৪০.০	৩৮.০-৪০.০ ২০.০-২৫.০	৪৫.০-৫০.০ ৩০.০-৩২.০
গ) উৎপাদন দক্ষতা দানাদার না খাইয়ে দৈহিক ওজন বৃদ্ধি (গ্রাম/দিন/ষাঁড়)	২৯৬.০	১৪০.০	১৭২.০
দানাদার সহ দেশী গরুতে দুধ উৎপাদন	৩.৫০-৪.০০	২.৫০-৩.০০	৩.৫০-৪০০০

বিএলআরআই কর্তৃক উন্নীত তিনটি নেপিয়ার জাতের চাষাবাদ কৌশলঃ

বিএলআরআই কর্তৃক উন্নীত তিনটি নেপিয়ার ঘাসের চাষাবাদ কৌশলের মধ্যে তেমন কোন ভিন্নতা নেই। এজন্য তিনটি জাতের উৎপাদন কৌশলগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হল।

বিএলআরআই নেপিয়ার ঘাসের চাষ পদ্ধতি জমি প্রস্তুতকালীন প্রতি হেক্টর জমিতে ৩০০-৫০০ মণ গোবর, ৫০ কিলো ইউরিয়া, ৭০ কিলো টিএসপি ও ৩০ কিলো এমপি সার প্রয়োগ করে ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে মাটি ঝুর ঝুরে করতে হবে। অঞ্চল ভেদে সারের পরিমাণের ভিন্নতা রয়েছে। উপরে বর্ণিত সারের মাত্রা দোআঁশ মাটির জন্য প্রযোজ্য হবে। লাল এবং বেলে মাটিতে চাষের সময় ইউরিয়ার পরিমাণ হেক্টর প্রতি ৭৫-১০০ কিলোতে বৃদ্ধি করতে হবে। ঘাস লাগানোর ৩০ দিন পর হেক্টর প্রতি ৫০ কিলো ইউরিয়া এবং প্রতি কাটিং পর একই হারে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে। যে সমস্ত খামারীগণ গবাদিপশু বা পোল্ট্রি খামারের বর্জ্য পানি জমা করতে পারেন, তাঁরা উক্ত বর্জ্য পানি নেপিয়ারের দু'টো লাইনের মাঝে পাম্প করতে পারেন। বর্জ্য পানি দেয়ার পর মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

আমাদের দেশে বন্যা প্রবণ এলাকা বাদে সারা বছরই নেপিয়ার চাষ করা যায়। মার্চ হতে অক্টোবর মাসে নেপিয়ার দ্রুত বৃদ্ধি

পায়, শীত শুরু হওয়ার সাথে সাথে নেপিয়ারের বৃদ্ধি হ্রাস পায়। এজন্য নেপিয়ার ঘাসের কাটিং করার উপযুক্ত সময় হচ্ছে অক্টোবর হতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত। বন্যামুক্ত এলাকায় জমি প্রস্তুত ও চাষাবাদ করার উপযুক্ত সময় হচ্ছে ডিসেম্বর হতে ফেব্রুয়ারী মাস। এ সময়ে জমি আগাছা মুক্ত করা সহজ। জমি তৈরির জন্য প্রয়োজনে পানি সেচের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ঘাস লাগানোর পর বৃষ্টি না হলে ২/১ টি সেচ দেয়া যেতে পারে। বৃষ্টি শুরু হওয়ার পর ঘাসে তেমন কোন সেচ প্রয়োজন নেই।

অনেকেই শীতকাল সেচ দিয়ে ঘাস ফলানোর চেষ্টা করেন। দিনের তাপমাত্রা ও বাতাসের জলীয়াংশ হ্রাস পেলে সেচ দিয়েও নেপিয়ারের কাঙ্খিত বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব নয়। তবে দেশের যে সমস্ত অঞ্চলে দিনের তাপমাত্রা ও জলীয়াংশ বেশি থাকে সে সমস্ত অঞ্চলে নেপিয়ারের বৃদ্ধি হতে পারে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ডিসেম্বর হতে ফেব্রুয়ারি মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত সাধারণত দিনের তাপমাত্রা ও বাতাসে জলীয়াংশ কম থাকে। অন্যান্য সময়ে দিনের তাপমাত্রা ও বাতাসে জলীয়াংশ নেপিয়ার চাষাবাদের জন্য খুবই উপযোগী।

কাটিং ব্যবহারে নেপিয়ার চাষ

নেপিয়ার গাছের পরিপক্ক কান্ডের তিনটি গিরা রেখে একটি কাটিং করতে হবে। ধারালো ছুরি/দা দিয়ে কান্ড কেটে কেটে কাটিং তেরি করতে হবে। জমি তৈরির পর সোজা লাইন করে ৬০ সে মি পর পর কাটিং লাগাতে হবে। কাটিং এর দু'টো গিরা মাটির নিচে এবং একটি গিরা মাটির উপরে থাকবে, এবং মাটির সাথে ৩০০ হেলানো অবস্থায় (অর্থাৎ মাটি হতে সর্বোচ্চ দু'আঙ্গুল হেলানো) কাটিং মাটিতে বসাতে হবে। দু'টো লাইনের মাঝে সর্বোচ্চ দুরত্ব ৯০ সেমি বা ৩ ফুট রেখে পরবর্তী লাইনে কাটিং লাগাতে হবে।

নেপিয়ার ঘাসের কাটিং

সিডলিং বা চারা ব্যবহার করে নেপিয়ার চাষ 'সিডলিং' ব্যবহারে নেপিয়ার চাষ সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে চাষকৃত ঘাস দ্রুত বৃদ্ধি পায় ও বংশ বৃদ্ধি ঘটায়। সিডলিং ব্যবহারে চাষ পদ্ধতিতে নিচের পদক্ষেপগুলো অনুসরণীয়

- মাটির উপরে ২-৩ সেমি রেখে নেপিয়ার ঘাস কাটুন
- পুরো নেপিয়ারের গুচ্ছটি ৪-৫ সেমি মাটির নিচ হতে তুলুন
- গুচ্ছ হতে প্রতিটি 'সিডলিং' বা চারা পৃথক করুন
- সিডলিং এর গোড়ায় বিদ্যমান মূলগুলো ৫ সেমি এর বেশী হলে ছেঁটে ফেলুন
- কাটিং পদ্ধতির নিয়মে লাইন করে চারাগুলো মাটির গর্তে বসিয়ে মাটি চেপে দিন।
- কিন্তু উপরের অংশে কোন মাটি দিবেন না।

সম্পূর্ণ কান্ড ব্যবহারে চাষাবাদ

সম্পূর্ণ কান্ড ব্যবহারে চাষাবাদ পদ্ধতিটি বন্যা কবলিত, অঞ্চল ও পাহাড়ী ঢালে বেশী উপযোগী। সমতল ভূমিতে ও পদ্ধতিটি অনুসরণ করা যেতে পারে। উক্ত পদ্ধতিতে নেপিয়ারের কান্ড অক্ষত গিরা সহ মাটির নিচে পুতে দিয়ে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। পাহাড়ী ঢালের আড়াআড়ি কন্টুর করে কান্ড বিছিয়ে মাটি দিয়ে ঢেকে দিলে প্রতিটি গিরা হতে নেপিয়ার গাছের চারা জন্মায়।

চাষ না দিয়ে নেপিয়ার চাষ

বন্যা কবলিত অঞ্চলে অক্টোবর মাসে যখন পানি নেমে যায় তখন নরম মাটিতে কান্ডটি শুইয়ে দিতে হবে। একটি কান্ড বিছানোর পর সোজা লাইনে আরও একটি কান্ড বিছাতে হবে। এভাবে লাইন করে সমস্ত জমিতে নেপিয়ারের কান্ড বিছিয়ে একইসাথে খেসারী বা মাসকালাই বুনতে হবে।

মাটিতে বিদ্যমান জলীয়াংশ ব্যবহারে নেপিয়ার ও খেসারী/মাসকালাই বড় হবে। জানুয়ারি মাসে নেপিয়ার সহ খেসারী/মাসকালাই সংগ্রহ করার পর কোঁদাল বা লাঙ্গল ব্যবহারে মাটি চাষ করে জমিতে ইউরিয়া সার ও সেচ দিতে হবে। এর ফলে নেপিয়ার দ্রুত বৃদ্ধি পাবে এবং পরবর্তী বন্যার পানি আসা পর্যন্ত ন্যূনতম ৩/৪ বার ঘাস সংগ্রহ করা যাবে।

ঘাস সংগ্রহ ও প্লট ব্যবস্থাপনা

(ক) বন্যামুক্ত এলাকা

বন্যামুক্ত এলাকায় নেপিয়ার ঘাস একবার লাগানোর পর বছরে ন্যূনতম ৩/৪ বার ঘাস সংগ্রহ এবং ৩/৪ বছর পুন:চাষের প্রয়োজন হয় না। ঘাস সংগ্রহের সময় মাটির কাছাকাছি (২-৩ সেমি উপরে) হতে ঘাস কাটতে হবে। মাটির উপরে লম্বা কান্ড রেখে কাটা হলে নেপিয়ারের মুথা ক্রমান্বয়ে মাটির উপরে বিস্তার লাভ করে, এবং মাটির সাথে মূলের শক্ত অবস্থান না থাকায় ঘাসের উৎপাদন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়।

- নেপিয়ার ঘাস ৯০-১২০ সেমি বা ৩-৪ ফুট লম্বা হলে কাটতে হবে; ক্ষেতে দীর্ঘ সময় ঘাস রেখে দিলে ঘাস ফুল ধরে যাবে এবং পুষ্টিমান হ্রাস পাবে।
- প্রতি বছর দু'লাইন নেপিয়ারের মধ্যবর্তী খালি জায়গা চাষ বা কোঁদাল দিয়ে মাটি আলগা করে গোবর এবং অন্যান্য সার প্রয়োগ করতে হবে।
- নেপিয়ার ছোপার মাঝের আগাছা পরিস্কার করে দিতে হবে।
- যেহেতু নেপিয়ার ঘাসে সেচ দিয়েও শীতকালে তেমন উৎপাদন পাওয়া সম্ভব নয় সেহেতু বৃষ্টির সময় প্রয়োজনীয় ঘাস সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করা যেতে পারে।
- কোন খামারী তার জমির পরিমাণ ও ঘাসের প্রয়োজনীয়তার উপর ঘাস সংগ্রহ পঞ্জিকা তৈরি করতে পারেন। একজন খামারীর দৈনিক ২০ কিলো সবুজ ঘাস প্রয়োজন হলে নিচের পঞ্জিকাটি ব্যবহার করতে পারেন।

বিএলআরআই নেপিয়ার-৩ ব্যবহারে একজন খামারীর প্লটে বছরব্যাপী ঘাস উৎপাদন পরিকল্পনা (বন্যামুক্ত এলাকার জন্য প্রযোজ্য)।

বন্যামুক্ত এলাকার একজন খামারী দৈনিক ৫০ কিলো ঘাস তার গরুকে সরবরাহ করবেন অথবা সপ্তাহে ৩৫০-৪০০ কিলো ঘাস বিক্রি করবেন। এ ধরনের একজন খামারীর সর্বোচ্চ ৩০ শতক জমিতে বিএলআরআই নেপিয়ার-৩ ঘাসটি চাষ করতে হবে। মনে রাখতে হবে নেপিয়ার ঘাস বছরের মে হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত অর্থাৎ ৬ মাস ঘাস উৎপাদন করতে পারে, বাকী ৬ মাসে (নভেম্বর হতে এপ্রিল) বৃষ্টি কম, শীত এবং বাতাসে জলীয়াংশ কম থাকায় নেপিয়ারের উৎপাদন কমে যায়। তাছাড়া জমির মাটি আগলা, সার প্রয়োগ এবং আগাছা পরিস্কার ইত্যাদি কাজের জন্য উক্ত ৬ মাস কেটে যায়। মে মাস হতে অক্টোবর পর্যন্ত ৬ মাসে মোট তিন বার ঘাস কাটা যাবে এবং ৩০ শতক জমি হতে সহজেই সর্বমোট ১৮-২৫ টন ঘাস উৎপাদন করা সম্ভব হবে। উক্ত ১৮-২৫ টন ঘাস উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন কারণে নষ্ট হওয়া ঘাস সহ সর্বমোট ৩২ শতক জমিতে ঘাস উৎপাদন পরিকল্পনা থাকতে হবে। উক্ত পরিকল্পনা নীচের ছকে দেখানো হল।

ব্লক-ক	ব্লক-খ			
১৬ শতক	৮ম সপ্তাহ ২ শতক	৭ম সপ্তাহ ২ শতক	৬ষ্ঠ সপ্তাহ ২ শতক	৫ম সপ্তাহ ২ শতক
	২ শতক ১ম সপ্তাহ	২ শতক ২য় সপ্তাহ	২ শতক ৩য় সপ্তাহ	৪র্থ ২ শতক সপ্তাহ

খামারীর করণীয়:

(১) পুরো ৩২ শতক জমিকে সমান দু'টো ব্লক (ব্লক-ক ও ব্লক-খ) এ ভাগ করতে হবে।

(২) ব্লক-ক অথবা ব্লক-খ কে ৮টি প্লট তৈরি করতে হবে।

(৩) দু'টো ব্লকেই বিএলআরআই নেপিয়ার-৩ ঘাসটি জানুয়ারী মাসের মধ্যে চাষ করতে হবে।

(৪) জমি চাষ এবং পরবর্তী পরিচর্যার জন্য পূর্ব বর্ণিত পদ্ধতি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৫) যেহেতু নভেম্বর হতে এপ্রিল মাস পর্যন্ত নেপিয়ার উৎপাদন হ্রাস পায় সেহেতু ব্লক-ক এ প্রতি কাটিং এ ৩.০-৩.৫ টন ঘাস উৎপাদন হবে। প্রতি কাটিং এর ঘাস মাটির গর্তে সাইলেজ করে সংরক্ষণ করতে হবে।

(৬) ব্লক-বি এর প্রতি প্লটের প্রতি কাটিং এর ঘাস প্রতি সপ্তাহে সংগ্রহ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে খামারী ইচ্ছা করলে প্রতি দিন ৫০-৬০ কিলো অথবা সপ্তাহের যে কোন সংখ্যক দিনে মোট ৩৫০-৪০০ কিলো ঘাস সংগ্রহ করতে পারেন। এরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করলে প্রতি পূর্ণ চক্র ঘাস সংগ্রহ শেষ করতে ৮ সপ্তাহ প্রয়োজন হবে। এরফলে এক চক্র শেষ করে পরবর্তী চক্র শুরু করা সম্ভব হবে। খামারী এভাবে তার গরুকে নিয়মিত সবুজ ঘাস সরবরাহ অথবা সপ্তাহের যে কোন দিন বাজারে নিয়ে বিক্রি করতে পারবেন।

বন্যাকবলিত অঞ্চলের জন্য বিএলআরআই নেপিয়ার-৩ উৎপাদন পরিকল্পনা:

বন্যাকবলিত ও বন্যামুক্ত অঞ্চলের মধ্যে নেপিয়ার উৎপাদনের পার্থক্য নিম্নরূপ:

(১) বন্যাকবলিত অঞ্চলের বন্যার পানি সাধারণত অক্টোবরের শেষের দিকে নেমে যায়। ঐ সময়ে কাঁদামাটিতে ঘাসের কাটিং, মুথা বা কান্ড পলি মাটিতে ফেলে দিতে হবে; কোন চাষাবাদ প্রয়োজন নেই।

(২) নেপিয়ারের সাথী ফসল হিসেবে খেসারী বা মাসকালাই ছিটিয়ে দিতে হবে।

(৩) জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারি মাসে খেসারী সংগ্রহের সময় একই সাথে নেপিয়ারও সংগ্রহ করতে হবে।

(৪) জমির মাটি কোদাল দিয়ে আলগা করে সার ও পানি প্রয়োগ করতে হবে।

(৫) জুলাই হতে অক্টোবর পর্যন্ত কোন ঘাস পাওয়া যাবে না এবং নেপিয়ার ঘাসও পঁচে যাবে।

(৬) বন্যাকবলিত অঞ্চলের জমি তুলনামূলকভাবে অধিক উর্বর থাকে। এ জন্য মার্চ হতে জুন মাসের মধ্যেই ন্যূনতম তিনবার ঘাস সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। অতএব, বন্যামুক্ত অঞ্চলের জন্য পূর্বে আলোচিত পরিকল্পনা মতে বছরের প্রয়োজনীয় সবুজ ঘাস উৎপাদন সম্ভব হবে।

পারা ঘাস (Brachiaria mutica):

বহুবর্ষী ঘাস, একবার লাগালে ৭-৮ বছর পর্যন্ত ঘাস উৎপন্ন হয়। এ ঘাসকে জলজ ঘাস বলা যায়। কারণ ইহা পানি প্রিয় ও স্যাঁতস্যাঁতে জমিতে ভাল জন্মে। তবে শুষ্ক জমিতেও পারা ঘাস উৎপন্ন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে ফলন কিছুটা কমে যাবে। বছরের যে কোন সময় চাষ করা যায়, তবে উত্তম সময় হচ্ছে ফাল্গুন থেকে আষাঢ় মাস। সীমিত লবনাক্ত এলাকা বা পাহাড়ী ঢালেও ঘাসটি জন্মে।

পারা ঘাস (Brachiaria mutica):

চাষ পদ্ধতি	সার প্রয়োগ	সেচ	ঘাস কাটার সময়	কাটিং সংখ্যা/বৎসর	ঘাস উৎপাদন
প্রচলিত পদ্ধতিতে জমি চাষ দিতে হবে। হেঃ প্রতি ২৮-৩০ হাজার কাটিং প্রয়োজন। লাইন থেকে লাইন ও কাটিং থেকে কাটিং এর দূরত্ব যথাক্রমে ৭০ সে.মি এবং ৩৫ সে.মি.।	জমি প্রস্তুত কালীন হেঃ প্রতি ইউরিয়া ৫০ কেজি, টিএসপি ৭০ কেজি ও এমপি ৩০ কেজি। ঘাস লাগানোর ১ মাস পর হেঃ প্রতি ৫০ কেজি ইউরিয়া। প্রতি কাটিং পর হেঃ প্রতি ৫০ কেজি ইউরিয়া।	খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর।	অঞ্চলভেদে গ্রীষ্ম কাল ৩০-৩৫ দিন পর, শীতকালঃ ৩৫-৪৫ দিন পর।	১ম বছর ৬-৭, পরবর্তী বছর গুলোতে ৭-৯ বার।	৮০-১২০ টন/হেঃ

ভূট্টাঃ

ভূট্টা

ভূট্টা একটি বর্ষজীবি অর্থকরী শস্য। ভূট্টার কচি সবুজ ঘাস গবাদিপশুর জন্য যেমন পুষ্টিকর ও উপাদেয় খাদ্য, ঠিক তেমনি এর দানা মানুষের জন্য বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু খাবার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। ভূট্টার জাতসমূহের মধ্যে বর্ণালী, শুভ্রা, খইভূট্টা, মোহর, বারি ভূট্টা ৫, বারি ভূট্টা ৬, প্যাসিফিক ১১, বারি হাইব্রিড ভূট্টা এবং হাইব্রিড ভূট্টা, কোয়ালিটি প্রোটিন মেইজ অন্যতম। অনেক হাইব্রিড ভূট্টার মোচা সংগ্রহ করার পরও এর গাছ সবুজ থাকে। এগুলো ভাল গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এর দানা হাঁস-মুরগি ও মাছের খাদ্য হিসেবে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। দেশের উত্তরাঞ্চলে ও ঢাকা বিভাগে ব্যক্তি উদ্যোগে ব্যাপকভাবে ভূট্টা চাষ হয়। মোট ভূট্টা চাষের জমির প্রায় ৮০ শতাংশই এসব অঞ্চলে অবস্থিত।

বাংলাদেশে রবি (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারি) ও খরিপ (মার্চ-অক্টোবর) উভয় মৌসুমেই ভূট্টা চাষ করা হয়। পানি নিষ্কাশনের সুযোগসহ দোআঁশ অথবা এঁটেল দোআঁশ মাটিতে ভূট্টা উৎপাদন করা যায়। পরিমাণ মত সার প্রয়োগ করা হলে বেলে দোআঁশ মাটিতেও ভূট্টা উৎপাদন সম্ভব। অধিক বৃষ্টি এবং অধিক শীত ভূট্টা সহ্য করতে পারে না। বীজ বপণের পূর্বে জমি উত্তমরূপে চাষের পর জমি তৈরি করে নিতে হয়। তারপর ৩-৪ বার মই দিয়ে মাটি চাষ করে ছোট করতে হবে। পচা গোবর, খামারজাত বা গৃহস্থালী আবর্জনা পঁচা সার প্রতি হেক্টরে ২০-২৫ মেঃ টন (৫৫০-৬৭০) মণ জমি চাষের সময় ভালোভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। গোবর সারের অতিরিক্ত হেক্টর প্রতি ইউরিয়া ৫০ কেজি, টিএসপি ৭০ কেজি, পটাশ ৩০ কেজি জমি তৈরির সময় দিতে হবে। গোবর সার না দিলে হেক্টর প্রতি ইউরিয়া ২০০-২৫০ কেজি প্রয়োগ করতে হবে। বপণের ৩০ দিন পর মাটির উর্বরতার উপর নির্ভর করে হেক্টর প্রতি ৩৫ থেকে ৪০ কেজি ইউরিয়া সার ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

ভূট্টার বীজ ছিটিয়ে বপণ করার চেয়ে লাইন বা সারি করে বপণ করা ভাল। লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব ৩০ সেঃমিঃ, বীজ থেকে বীজের দূরত্ব ৫ সেঃ মিঃ ও ৩-৫ সেঃমিঃ গভীরে বীজ বপণ করতে হয়। ঘাস উৎপাদনের জন্য হেক্টরপ্রতি ২৪-২৮ কেজি এবং দানা উৎপাদনের জন্য হেক্টরপ্রতি ১৮-২০ কেজি ভূট্টা বীজের দরকার। জমি তৈরীর পর যদি দেখা যায় মাটি শুকিয়ে গেছে তবে বীজ বপণের আগে পরিমাণমত সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। খরা মৌসুমে ভূট্টার বীজ বপণ করলে প্রতি ১০-১৫ দিন পর পর প্রায় ৩-৪ বার পানি সেচের প্রয়োজন হয়। অতিরিক্ত পানি সেচ ভূট্টা গাছের জন্য ক্ষতিকর। ভূট্টা গাছ ১৫-২০ সেঃমিঃ লম্বা হলে নিড়ানী বা কোদাল দ্বারা আগাছামুক্ত রাখতে হবে। সবুজ ঘাস হিসেবে ভূট্টা বপণের ৮-৯ সপ্তাহ পর গাছের রং সবুজ থাকা অবস্থায় অর্থাৎ ফুল ও মোচা হওয়ার পূর্বে কাটতে হয়। তবে, বর্তমানে গো-খাদ্যের জন্য অধিক পুষ্টিমান সম্পন্ন ভূট্টা ঘাস পাওয়ার জন্য ভূট্টার দানা হলুদ বর্ণ ধারণ করার পর মোচাসহ গাছ কেটে টুকরা টুকরা করে সংরক্ষণ করা হয়। সবুজ ঘাস হিসেবে হেক্টর প্রতি ৬০-৬৫ মেঃ টন ঘাস উৎপাদিত হয় এবং হাইব্রিড ভূট্টা হতে রবি ও খরিপ মৌসুমে হেক্টর প্রতি দানা উৎপন্ন হয় যথাক্রমে ৬-১০ মেঃ টন ও ৪-৫ মেঃ টন। তাছাড়া প্রতি ঋতুতে হেক্টর প্রতি ভূট্টার খড় উৎপন্ন হয় প্রায় ২৫-৫০ মেঃ টন।

ভূট্টার সাথে ফসল হিসেবে কাউপি, মাসকালাই, খেসারী ও ধৈঞ্চা ব্যবহার করা যায়।

ভূট্টার পুষ্টিমান নিচের সারণীতে দেয়া হল

ভূট্টার অবস্থা	শুষ্ক পদার্থ%	জৈব পদার্থ%	আমিষ%	খনিজ%	এডিএফ%	আঁশ%	ইথার এক্সট্রাক্ট %
দানা	৯০	৯৮	১০	২	-	৩	৪
মোচাসহ ঘাস	৩০	৯৩	৬	৭	৪৪	-	-
ভূট্টা খড়	৩৫	৯৪	৮	৬	৪৮	-	-

ভূট্টার কোন কিছুই ফেলা যায় না। ভূট্টা ঘাস, দানা বা ভূট্টা এসবই গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি ও মাছের উৎকৃষ্ট মানের খাদ্য। ঘাস হিসেবে চাষ করলে ভূট্টার মোচা হলুদ বর্ণের পরিপক্কতা লাভ করলে সেই অবস্থায় গাছসহ কেটে ২-৩ ইঞ্চি আকারে টুকরো টুকরো করে সাইলেজ তৈরি করে সংরক্ষণ করা যায়। এতে ঘাসে আমিষ ও শক্তির মাত্রা বেড়ে যায়। অন্যদিকে, ভূট্টার দানা পরিপক্ক হলে মোচা সংগ্রহ করার পর পরিত্যক্ত ভূট্টার খড়ও সাইলেজ করে সংরক্ষণ করে উৎকৃষ্ট মানের পশু খাদ্য তৈরি করা

যায়। উল্লেখ্য হাইব্রিড ভূট্টার খড়, ভূট্টার দানা সংগ্রহ করার পরও সবুজ ও সতেজ থাকে। এই খড়ের পুষ্টিমান অনেক ক্ষেত্রেই সবুজ ঘাসের সমতুল্য। ভূট্টার খড় হতে বছরে দু'বার সাইলেজ করা যায় এবং সারা বছর পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ভূট্টার দানা গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি ও মাছের জন্য একটি উৎকৃষ্টমানের শক্তির উৎস। গবাদিপশুকে যথেচ্ছা পরিমাণ মোচাসহ তৈরিকৃত ভূট্টার সাইলেজ বা ভূট্টা খড়ের সাইলেজ খাওয়ানো যায়। একটি পূর্ণবয়স্ক গাভী বা মোটাতাজাকরণের ষাঁড় দৈনিক মোট ২৫-৩৫ কেজি মোচাসহ তৈরিকৃত ভূট্টা গাছের সাইলেজ খেয়ে থাকে। পূর্ণবয়স্ক ছাগল-ভেড়াকে দৈনিক ১.৫-২.০ কেজি হারে এই সাইলেজ সরবরাহ করা যেতে পারে। ভূট্টা খড়ের সাইলেজ একটি পূর্ণবয়স্ক গাভী ১৮-২৫ কেজি পরিমাণ খেতে পারে। ভূট্টার দানা গাভী, মোটাতাজাকরণের ষাঁড়, ছাগল-ভেড়ার দানাদার খাদ্যের শতকরা ৪০ ভাগ পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।

উন্নত জাতের ঘাস প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ এবং ৫ টি গরুর জন্য সাইলেজের পরিমাণ নির্ণয়

সাইলেজ বলতে কি বুঝায়?

সাইলেজ

সাধারণভাবে বায়ুরোধক অবস্থায় সংরক্ষিত সবুজ ঘাসকে সাইলেজ বলা হয়ে থাকে। অথবা সাইলেজ হলো গাজনকৃত সবুজ ঘাস। উচ্চ আর্দ্রতাযুক্ত সবুজ ঘাসকে বায়ুহীন পরিবেশে সংরক্ষণ করা হয়। এই প্রক্রিয়াজাত ফডারকে সাইলেজ বলে। বায়ুহীন পরিবেশে পর্যাপ্ত আর্দ্রতাযুক্ত (৬০-৬৫%) ফরেজ বা সবুজ ঘাসকে সংরক্ষণ করলে এতে কিছু রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে এবং এই প্রক্রিয়া বা পরিবর্তন ঘটানোর প্রক্রিয়াকে এনসাইলিং বলে। সাইলেজ তৈরির প্রধান উদ্দেশ্য হলো, যে মৌসুমে সবুজ ঘাসের আধিক্য থাকে, সে মৌসুমে সাইলেজ প্রস্তুত করা এবং সবুজ ঘাসের অভাবের সময় গবাদি পশুকে তার সরবরাহ নিশ্চিত করা। এতে কাঁচা ঘাসের অপচয় কম হয় এবং উহার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। সাইলেজ তৈরির মূলনীতি হলো, যখন উদ্ভিদ কোষ অক্সিজেন (O_2) বিহীন অবস্থায় ফারমেন্টেটেড হয়, তখন ল্যাকটিক এসিড উৎপন্ন তৈরি হয়ে থাকে এবং এই ল্যাকটিক এসিড সবুজ ঘাস সংরক্ষণে সহায়তা করে থাকে।

অধিক উপযোগী ফডার

বিভিন্ন ধরনের ঘাস হতে সাইলেজ তৈরি করা হয়ে থাকে। সাইলেজ তৈরি করার জন্য সাধরণতঃ নন- লিগিউম জাতীয় ফডার বা সবুজ ঘাস সবচেয়ে বেশি উপযোগী। যেমন, ওট, ভূট্টা, যোয়ার, নেপিয়ার প্রভৃতি অন্যতম। তবে লিগিউম জাতীয় ফডার দিয়েও সাইলেজ তৈরি করা যেতে পারে। লিগিউম জাতীয় ফডার যেমন, বারশিম, লুসার্ণ, কাউপি কিংবা মাটি কালাই দিয়ে সাইলেজ তৈরি করতে হলে বিশেষ প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। যেমন, বারশিমের সাথে ওট এবং কাউপির এর সাথে ভূট্টা মিশিয়ে অথবা খড় মিশিয়ে সাইলেজ করা যায়। এভাবে সাইলেজ তৈরি করলে লিগিউমিনাস ফডারে যে কার্বোহাইড্রেট কম থাকে তার অভার পূরণ করে কার্বোহাইড্রেট পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং পানির পরিমাণ কমে আসে। ফলে, সাইলেজ ভালভাবে সংরক্ষিত হয়ে থাকে এবং খড় ব্যবহার করলে তার পুষ্টিমানও বৃদ্ধি পায়।

আবহাওয়া, খামারের আকার, খামারের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং উপযোগীতার উপর ভিত্তি করে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার সাইলো পিট ব্যবহার করা হয়। নিম্নে কয়েকটি সাইলো পিটের নাম দেয়া হলোঃ

সাইলো বিভিন্ন ধরনের হতে পারেঃ

১। টাওয়ার সাইলো
   (ক) কংক্রিট স্টেভ
   (খ) কাঠের স্টেভ
   (গ) টাইলব্লক
   (ঘ) ইটের স্টেভ
২। গ্যাসটাইট সাইলো
   (ক) কংক্রিট স্টেভ
   (খ) ইটের স্টেভ

৩। পিট সাইলো
৪। সমান্তরাল সাইলো
(ক) ট্রেঞ্চ সাইলো (মাটির গর্তে)
(খ) বাঙ্কার সাইলো (মাটির উপর)
৫। স্বল্পস্থায়ী সাইলো
(ক) প্লাস্টিক বা পলিথিন ব্যাগ সাইলো

আমাদের দেশের কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে, সহজে ও কম খরচে একজন কৃষক যাতে সাইলেজ তৈরি করতে পারে তা সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করা হলো।

মাটির গর্ত পদ্ধতি

এই পদ্ধতি অনুসরণ করে খামারীরা অতি সহজেই সাইলেজ তৈরি করতে পারেন। এই পদ্ধতিতে প্রচলিত ফডার ছাড়াও অপ্রচলিত ফডার যেমন মেইজ স্ট্রভার এমনকি প্রাকৃতিক সবুজ ঘাস প্রভৃতিকে সাইলেজ হিসেবে সংরক্ষণ করা যায়। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশে বর্ষা মৌসুমে যে পর্যাপ্ত সবুজ ঘাস পাওয়া যায় তা এ পদ্ধতি অনুসরণ করে সাইলেজ করা যায়।

মাটির গর্তে সাইলেজ তৈরি

মাটির গর্ত তৈরি:

একশত ঘনফুট (১০০) একটি মাটির গর্তে ২.৫০-৩.০০ টন সবুজ ঘাস সংরক্ষণ করা যায়। সাইলেজের গর্তটি উঁচু জায়গায় হতে হবে, যাতে গর্তের মধ্যে পানি ঢুকতে না পারে। গর্তের গভীরতা ৩ ফুট, প্রস্থের তলায় ৩ ফুট, মাঝে ৮ ফুট ও উপরে ১০ ফুট হতে হবে। গর্তের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ সবুজ ঘাসের পরিমাণের উপর নির্ভর করে থাকে। গর্তের তলার চার কোণা পাতিলের মত সমভাবে বক্র থাকলে ঘাস চাপানো সহজ হবে। মাটির গর্তে ঘাস সাজানোর সময় সাইলোর চারিদিকে পলিথিন মুড়ে অথবা সাইলোর নিচে এবং চারিদিকে খড় দিয়ে মাটি ঢেকে তার উপর স্তরে স্তরে ঘাস সাজিয়ে "সাইলেজ" করলে ঘাস নিশ্চিন্তে অনেক দিন রাখা যায়। নিম্নে ২০ ফুট লম্বা একটি মাটির গর্তের সাইলো নমুনা দেখানো হলো।

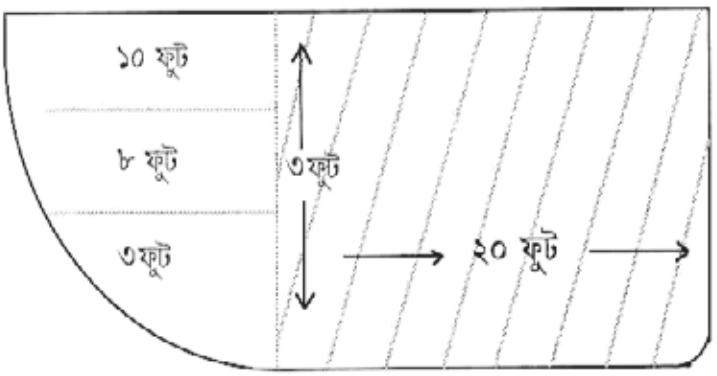

সাইলেজ তৈরির পদ্ধতি:

যে ঘাসের সাইলেজ প্রস্তুত করা হবে তা প্রথমে টুকরা টুকরা কেটে নিতে হবে। সাইলোতে ঘাস দেওয়ার পূর্বে তলায় পলিথিন অথবা পুরু করে খড় বিছাতে হবে। টুকরা টুকরা করা সবুজ ঘাস সাইলো পিটের মধ্যে স্তরে স্তরে সাজাত হবে যেন ভিতরে বাতাস না থাকে। ফডার যত বেশি চাপাইয়া মাটির গর্তে রাখা যাবে সাইলেজ তত বেশি উন্নত মানের হবে। সাইলেজ মোলাসেসসহ অথবা মোলাসেস ছাড়াও করা যেতে পারে। মোলাসেস ব্যবহার করলে, সুবজ ঘাসের শতকরা ৩-৪ ভাগ চিটাগুড় মেপে একটি চাড়িতে নিতে হবে। তারপর ঘন চিটাগুড়ের মধ্যে ১ঃ১ অথবা ৪ঃ৩ পরিমাণে পানি মিশালে সেটা ঘাসের উপর ছিটানোর উপযোগী হবে। ঝরনা বা হাত দ্বারা ছিটিয়ে এ মিশ্রণ ঘাসে সমভাবে মিশানো যাবে। প্রতি পরতে ৩০০ কেজি ঘাসের পরতে পূর্বের হিসেবে ৯ থেকে ১২ কেজি চিটাগুড় ও ৯ থেকে ১২ কেজি পানিতে মিশিয়ে উক্ত মিশ্রণ ঝরনা বা হাত দিয়ে সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে। সবুজ ঘাসের সাথে শুকনো খড় ব্যবহার করলে এক স্তর কাচা ঘাস এবং এক স্তর খড় দিতে

হবে। উপরের নিয়মে প্রতি ৩০০ সবুজ ঘাসের সাথে ১৫ কেজি খড় দিতে হবে এবং ঘাস সাজানোর পর মোলাসের দিতে হবে। খড়ের মধ্যে কোন মোলাসেস বা চিটাগুড় দিতে হবে না। যতটা সম্ভব ভালভাবে পা দিয়ে পাড়িয়ে ভাল ভাবে আটঁসাঁট করে ভিতরের বাতাস বের করে দিতে হবে। সবুজ ঘাস যত এঁটে সাজানো যাবে সাইলেজ তত সুন্দর হবে। সাইলো ভর্তি করে মাটির উপরে ৪-৫ ফুট পর্যন্ত ঘাস সাজাতে হবে। সব শেষে পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। পলিথিন দিয়ে ঢাকার পর ৩-৪ ইঞ্চি পুরু করে মাটি দিতে হবে যাতে বাতাসে উড়ে না যায় বা অন্য কোন পশু দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, সাইলো গর্ত একদিনেই সাজানো ভাল। তবে একদিনে বৃষ্টি অথবা অন্য কোন কারণে সাজানো সম্ভব না হলে প্রতিদিন অল্প অল্প করেও কয়েকদিনব্যাপী সাজিয়ে সাইলেজ তৈরি করা যায়।

ঝুড়ি বা ব্যাগ সাইলেজঃ

ঝুড়ি বা ব্যাগ সাইলেজ

মাটির গর্ত ছাড়াও পলিথিন ব্যাগে সাইলেজ তৈরি করা যায়। আমাদের দেশের যে সমস্ত কৃষক ক্ষুদ্র আকারের ডেইরী খামার পরিচালনা করেন তাদের জন্য পলিথিন ব্যাগ পদ্ধতি খুবই উপযোগী। এই পদ্ধতিতে একজন কৃষক তার প্রয়োজনের তাগিদে ৫০ কেজি থেকে ২০০ কেজি আকারের ব্যাগ সাইলেজ তৈরি করতে পারেন। এ ধরনের ব্যাগ সাইলেজ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অতি সহজেই স্থানান্তর করা যায়। এ পদ্ধতিতে কৃষকের নিজস্ব কোন গবাদি পশু না থাকলেও তিনি তার নিজস্ব জমিতে শুধু ঘাস উৎপাদন এবং ব্যাগ সাইলেজ করে বাজারে বিক্রি করতে পারবেন। কেননা ব্যাগ সাইলেজ অতি সহজেই পরিবহন করা যায়। মাটির গর্তে সাইলেজ তৈরির যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, ব্যাগ পদ্ধতিতে ঠিক একই ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। ব্যাগ পরিপূর্ণ করার পর ভালভাবে মুখ বেধে রাখতে হবে। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনসটিটিউট গবেষণা করে দেখেছে যে, ব্যাগ পদ্ধতিতে যে ধরনের সবুজ ঘাস এমনকি মেইজ স্টোভার সাইলেজ করে ৬ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রাখা যায়।

সাইলেজ তৈরির সময় যে বিষয় খেয়াল রাখা উচিতঃ

১। সাইলেজ তৈরির জন্য ঘাসে অবশ্যই ৩০-৩৫ শতাংশ শুস্কপদার্থ (ড্রাইমেটার) থাকা প্রয়োজন ।

২। নিচু জায়গায় সাইলো করা যাবে না ।

৩। উপরের পলিথিন সুন্দরভাবে এঁটে দিতে হবে যাতে কোন পানি "সাইলেজ" এর ভিতরে প্রবেশ না করে।

৪। চিটাগুড় পাতলা হলে পরিমাণ বাড়িয়ে পানি কম করে মিশাতে হবে অর্থাৎ এমনভাবে দ্রবণ তৈরি করতে হবে যাতে আঠার মত ঘাসের গায়ে লেগে থাকে।

৫। ঘাস এবং খড় এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে ফাঁকা জায়গাগুলো যথাসম্ভব বন্ধ হয়ে যায়। বিশেষ করে, সাইলোর কোনাগুলো এবং পাশসমূহ পা দিয়ে পাড়িয়ে ঘাস সাজাতে হবে ।

৬। গরু বাছুর, শেয়াল যাতে উপরের পলিথিন নষ্ট না করে সেদিকে খেয়াল করতে হবে ।

প্রয়োজনে সাইলেজ এডিটিভ বা প্রিজারভেটিভ সংযোজনঃ

(১) পুষ্টি উপাদান সংমিশ্রণ
(২) গাঁজনযোগ্য শর্করা
(৩) জৈব এসিড
(৪) অনাকাঙ্খিত মোল্ড বা ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধী দ্রব্য
(৫) সরাসরি বা আংশিক অক্সিজেন হ্রাস
(৬) সাইলেজের আদ্রতা হ্রাস
(৭) নাইট্রোজেনের পরিমান বৃদ্ধি ও
(৮) গলিত বা পদার্থ হিসেবে যে এসিড বেরিয়ে যায় তার সংমিশ্রণ

কয়টি সাইলেজ এডিটিভ বা প্রিজারভেটিভের নাম:

১। চিটাগুড় ঃ ৩-৪ % হারে
২। ইউরিয়া ঃ ০.৫% হারে
৩। লাইমস্টোন ঃ ০.৫-১% হারে
৪। জৈব এসিড ঃ ১% হারে
৫। ব্যাকটেরিয়াল কালচারঃ প্রয়োজন মত

সাইলেজ সংরক্ষণের মূলনীতি:

সাইলো পিটে সবুজ ঘাস টুকরা টুকরা করে কেটে পরতে পরতে সাজানোর পরও উহার মধ্যে হাজার হাজার ছোট ছোট পকেটের ফাঁকে অক্সিজেন (O_2) থেকে যায়। যার ফলে উদ্ভিদ এনজাইমের এ্যারোবিক শ্বসন ক্রিয়া শুরু হয়। এমতাবস্তায়, ঘাসে উপস্থিত শ্বেতসার এর এক অংশ জারণ ক্রিয়ার দ্বারা তাপসহ কার্বন ডাই অক্সাইড ও পানি উৎপন্ন করে, ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। ব্যবহারিকভাবে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই সমস্ত কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2) শেষ হয়ে যায় এবং উহা মোল্ডের বৃদ্ধি ব্যহত করে, যা কার্বন ডাই অক্সাইডের (CO_2) উপস্তিতিতে বৃদ্ধি ঘটতে পারে না। সাইলো পিটের মধ্যে অতিরিক্ত পরিমাণে বায়ু থাকলে বেশি তাপ উৎপন্ন হয়, ফলে সাইলেজের উপর গাঢ় বাদামী বা কালো রঙের দানা পড়ে। ইহাতে দ্রবনীয় শ্বেতসার অধিক পরিমাণ নষ্ট হয় এবং আমিষের পরিপাচ্যতা কমে যায়। ফলে সাইলেজের পুষ্টিমান খুবই নিম্নমানের হয়।

এরোবিক শ্বসনের পর মাইক্রোবিয়াল পরিবর্তন শুরু হয়। কোন কোন এসিড তৈরি যেমন *Streptococcus lactis, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus faecalis, Pediococcus acidilacti, Lactobacillus copyneformis* ইত্যাদি উদ্ভিদ কোষকে মিডিয়াম হিসেবে ব্যবহার করে অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। অক্সিজেন অনুপস্থিতির কারণে তাদের বৃদ্ধির জন্য অনুকুল অবস্থার সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় সুগার পরিবর্তিত হয়ে প্রধানতঃ ল্যাকটিক এসিডে পরিণত হয় এবং পরে ইহা অন্যান্য ফ্যাটি এসিড যেমন ফরমিক এসিড, এসেটিক এসিড, প্রোপাওনিক ও বিউটারিক এসিডে পরিণত হয়। সাইলো স্তুপের মধ্যে এসিডের পরিমাণ কমে পি এইচ ৩.৭ হলে ব্যাকটেরিয়াল গাঁজন বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তিতে এই এসিডগুলো অন্যান্য ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়াকে নিধন করতে সহায়তা করে এবং সাইলেজকে দীর্ঘদিন সংক্ষরণ করতে সহায়তা করে। তবে এক্ষেত্রে সাইলেজের বায়ুহীন অবস্থা বজায় রাখতে হবে।

সাইলোক্রিয়ার সময় প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ প্রোটিন ভেঙ্গে এমাইনো এসিডে রূপান্তরিত হয়। প্রোটিনের পুষ্টিমানের উপর প্রভাব বিস্তার না করলেও উহা সংক্ষরণের জন্য খারাপ পদার্থ। এমাইনো এসিড ভেঙ্গে বিভিন্ন এমাইন তেরি করে যেমন, ট্রিপটামিন, ফিনাইল ইথায়লামিন, হিস্টামিন, বিউটেন ও পেন্টামিথাইলিন ডাই এমিন প্রভৃতি।

নিম্নে সংক্ষিপ্ত বিক্রিয়া দেয়া হলো

সবুজ ঘাস + ৬ অনু পানি + ৬ অনু কার্বন ডাই অক্সাইড + ৬৭৩ ক্যালোঃ শক্তি ---------- চিনি + অক্সিজেন
চিনি ---------- ল্যাকটিক এসিড
ল্যাকটিক ----------বিউটারিক এসিড + পানি + কার্বন ডাই অক্সাইড

সাইলেজের উপকারিতা:

১। ঘাসের সাইলেজে ৮৫ % পুষ্টি পাওয়া যায়
২। এখানে ঘাসের সমস্ত অংশই সংরক্ষণ করা যায়
৩। বর্ষা মৌসুমে কাচা ঘাস সংরক্ষণ বরা কঠিন কিন্তু সাইলেজ সহজেই সংরক্ষণ করা সম্ভব
৪। সাইলেজ অত্যন্ত সুস্বাদু ও ল্যাকটিক এসিড খাদ্য
৫। এটা আমিষ ও ভিটামিনের উৎস

ভাল সাইলেজের বৈশিষ্ট্য

১। সাইলেজের রং হলুদাভ সবুজ
২। গন্ধ আচারের ন্যায় অম্ল সুগন্ধ
৩। পিএইচ ৩.৫-৪.৫

সাইলেজ খাওয়ানো

গবেষণায় দেখা গেছে যে, ১০০ কেজি ওজনের একটি ষাঁড় দৈনিক গড়ে তার দৈহিক ওজনের ১.৯২ হারে সাইলেজ শুষ্কপদার্থ গ্রহণ করে থাকে। দুধাল গাভী প্রতিদিন কি পরিমাণ দুধ উৎপাদন করে তার উপর ভিত্তি করে সাইলেজ সরবরাহ করতে হয়। গবেষণায় কোন কোন বিজ্ঞানী দেখেছেন যে, যেখানে সাইলেজকে একক রাফেজ হিসেবে ব্যবহৃত, সেখানে একটি গাভী প্রতি ৫০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ৩ কেজি পরিমাণ সাইলেজ গ্রহণ করে থাকে। সাইলেজ এর সঙ্গে কাচা ঘাস অথবা শুকনা খড়ও একত্রে গবাদি পশুকে খাওয়ানো যেতে পারে। সাধারণ নিয়মে দুই ভাগ সাইলেজ এর সাথে এক ভাগ কাচা ঘাস ও এক ভাগ খড় মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে।

হেঃ

'হে'

পশু খাদ্য সংরক্ষণের উপায় হিসেবে 'হে' তৈরিকরণ একটি উৎকৃষ্টতম পন্থা। অতি প্রাচীনকাল থেকে পশু খাদ্য হিসেবে 'হে' বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বাংলাদেশে 'হে' তৈরি ব্যাপকভাবে প্রচনল না থাকলেও কিছু কিছু এলাকায় এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে খামারীরা ব্যবহার করে আসছেন। বাংলাদেশে বিভিন্ন ঋতুতে কাঁচা ঘাসের সহজলভ্যতা সমান না হওয়ায় যে সকল ঋতুতে কাঁচা ঘাস বিশেষ করে লিগিউম জাতীয় ঘাস সহজেই পাওয়া যায় সে সকল কাঁচা ঘাস 'হে' তৈরি করে খামারীরা সংকটকালীন ব্যবহার করতে পারেন।

সাধারণভাবে 'হে' বলতে শুকনা ঘাস বা সীমজাতীয় শুকনা ঘাসকে বুঝায় যার মধ্যে সর্বোচ্চ শতকরা ২০ ভাগ কিংবা তার চেয়ে কম পানি থাকে এবং যার মধ্যে শুষ্ক পর্দাথের পরিমাণ (Dry matter) শতকরা ৮৫ থেকে ৯০ ভাগ পর্যন্ত থাকে। উন্নত মানের 'হে' দেখতে সবুজ রঙের, পাতাযুক্ত, সহজেই হজমযোগ্য এবং যে কোন ধরনের ছত্রাক আক্রান্ত থেকে মুক্ত থাকবে। 'হে' তৈরি করার সময় ঘাসের সারীর বৃদ্ধির অবস্থার কথা বিবেচনা করে কর্তন করা উচিৎ। উৎকৃষ্ট মাণের 'হে' তৈরি করার জন্য ঘাসে যখন ফুল আসে তখন কর্তন করা উচিৎ। ফসল ফুল আসা অবস্থায় কর্তন করে 'হে' প্রস্তুত করলে উহার গুণগত ও পুষ্টিমান ভাল হবে এবং এ জাতীয় 'হে' কে অনেক দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যাবে।

'হে' তৈরির মূলনীতিঃ

'হে' তৈরির মূলনীতি হলো ঘাসের ফসলের মধ্যে রক্ষিত পানির পরিমাণকে কমিয়ে এনে এমনভাবে 'হে' তৈরি করতে হবে যাতে 'হে' এর মধ্যে গাজন না ঘটে এবং প্রস্তুতকৃত 'হে' কে সহজেই সংরক্ষণ করা যায়। 'হে' শুকানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে

যাতে বৃষ্টির পানি 'হে' এর উপর না পড়ে এবং যাতে ঘাস থেকে অধিক হারে পাতা ঝড়ে না পড়ে যায়। সঠিকভাবে শুকানো 'হে' দুগ্ধ উৎপাদনকারী গাভী সহ অন্যান্য পশুসম্পদের জন্য উৎকৃষ্ট মানের খাদ্য বিশেষ করে যে সমস্ত ঋতুতে কাঁচা ঘাসের অভাব বিদ্যমান থাকে। কাঁচা ঘাসের পরিপূরক বা বিকল্প হিসেবে শুষ্ক 'হে' গবাদিপশুর খাদ্য হিসেবে stomach পরিপূর্ণ রাখতে সাহায্য করতে এবং উহার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

উন্নত মানের 'হে' তৈরির শর্তাবলী:

(১) ভাল গুণাগুন সম্পন্ন 'হে' অবশ্যই অধিক পাতাযুক্ত হবে।

(২) ভাল মানের 'হে' তে অবশ্যই অধিক পাতাযুক্ত থাকবে। 'হে' অধিক পাতাযুক্ত হলে উহার খাদ্যমান অধিক হবে। পাতায় সাধারণতঃ অধিক পরিমাণে প্রোটিন, ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ বিদ্যমান থাকে। বিধায়, 'হে' তৈরির সময় অধিক পাতা ঝড়ে গেলে 'হে' এর গুণগতমান নষ্ঠ হয়ে যায়।

(৩) 'হে' তৈরির জন্য ঘাস অবশ্যই ফুল ধরার সময় কাটতে হবে, যাতে অধিক পরিমান পুষ্টি উপাদান 'হে' এর মধ্যে ধরে রাখা সম্ভব হয়। ফল ধরার সময় ঘাস কর্তন করলে 'হে' এর পুষ্টিমান অনেকটা ফলের দানার মধ্যে চলে যায় এবং ফলে উহার পুষ্টিমান কমে যায়।

(৪) 'হে' এর রং সবুজ থাকবে যাতে 'হে' এর পাতায় অধিক হারে কেরোটিনের পরিমাণ বিদ্যমান থাকে।

(৫) 'হে' অবশ্যই নরম ও সহজেই হজমযোগ্য হতে হবে।

(৬) 'হে' তে অন্য কোন অবর্জনা কিংবা ছত্রাক মুক্ত হতে হবে।

(৭) 'হে' অবশ্যই আগাছা মুক্ত এবং অন্যান্য ময়লা মুক্ত হতে হবে।

(৮) 'হে' এর নিজস্ব এ্যারোমেটিক এবং সুগন্ধ হতে হবে।

(৯) 'হে' এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে তৈরিকৃত 'হে' এর মধ্যে শতকরা ১৫ ভাগ কিংবা তার চেয়ে কম পরিমাণ পানি থাকবে। সাধারণতঃ ফসলের পুষ্টিমানের উপর 'হে' এর পুষ্টিমান নির্ভর করে। তবে দেখা যায় যে, 'হে' এর মধ্যে সাধারণতঃ শতকরা ২৫ থেকে ৩০ ভাগ আঁশ এবং ৪৫-৬০ ভাগ TDN থাকে।

'হে' এর প্রকারভেদ:

(১) শীমজাতীয় 'হে': খেসারী, মাটিকালাই, কাউপি, প্রভৃতি শুকিয়ে যে 'হে' তৈরি করা হয়, তাকে শীমজাতীয় (লিগুম) 'হে' বলে। শীমজাতীয় 'হে' এর মধ্যে অধিক পরিমাণ আমিষ, ভিটামিন এমন কি ভিটামিন ডি এর পরিমাণ বেশি থাকে। তাছাড়া এ জাতীয় 'হে' এর মধ্যে ক্যালসিয়ামের আধিক্য থাকে এবং ইহা গবাদিপশুর জন্য অত্যন্ত সুস্বাদু। ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ডি এবং ভিটামিন এ এর অধিক্য ছাড়াও শীমজাতীয় 'হে' এর মধ্যে ভিটামিন ই এর পরিমাণও বেশি থাকে।

(২) নন-লিগুমিনাস 'হে': লিগুমিনাস 'হে' এর তুলনায় নন-লিগুমিনাস হে তে পুষ্টিমান সাধারণতঃ কম থাকে। তবে নন-লিগুমিনাস 'হে' এর একটাই সুবিধা এগুলো লিগুমিনাস হে এর তুলনায় অধিক পরিমাণে উৎপাদন করা যায়। নন-লিগুমিনাস 'হে' তৈরি করতে যে সমস্ত ফসল ব্যবহার করা হয়, তন্মধ্যে ওট, বার্লি, ট্রিটিক্যালি এর নাম উল্লেখযোগ্য। নন-লিগুমিনাস 'হে' তে প্রোটিন ও ভিটামিনের তুলনায় শ্বেতসার জাতীয় পুষ্টিমানের পরিমাণ বেশি থাকে।

(৩) মিশ্র 'হে': লিগুমিনাস এবং ননলিগুমিনাস ফসলের সমন্বয়ে যে 'হে' তৈরি হয়, তাকে মিশ্র 'হে' বলে। এই জাতীয় মিশ্র 'হে' এর পুষ্টিমান নির্ভর করে দুইটি ফসলের মিশ্ররের অনুপাতের উপর। তাছাড়া, নন-লিগুমিনাস ও লিগুমিনাস ফসলের কর্তনের সময়ের তারতম্য হওয়ার কারণে পুষ্টিমানেরও তারতম্য হতে দেখা যায়। যদি নন-লিগুমিনাস ফসলকে ফল আসার আগে কর্তন করা হয়, তখন এ জাতীয় 'হে' তে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি থাকে।

(৪) 'হে' তৈরির জন্য ফসলের কর্তন সময়: 'হে' তৈরির জন্য ফসলের কর্তন সময় (Harvesting time) অতীব গুরুত্বপূর্ণ। 'হে' ভাল মানের "হে" তৈরীর জন্য ফসলকে অবশ্যই দিনের বেলায় ঘাস থেকে স্পিন্দির শুকিয়ে গেলে কর্তন করতে হবে যাতে কর্তন করার পর ফসলকে সমানভাবে ক্ষেতের মধ্যে ছিটিয়ে দেয়া যায় এবং সমানভাবে রোদের তারা পড়ে। ঘাস কর্তন করার সময় আর একটি বিষয় খেয়াল রাখা দরকার যেন ক্ষেত ভিজা না থাকে। ক্ষেত ভিজা থাকলে কর্তনকৃত ফসলকে সমানভাবে রোদে শুকানো সম্ভব হবে না। আর একটি বিষয় খেয়াল রাখা দরকার ফসলকে অতিরিক্ত পরিপূর্ণতা (Maturity) হওয়ার আগেই কর্তন করা। অর্ধেক অথবা এক-তৃতীয়াংশ ফসলের ফুল আসা অবস্থায় কর্তন করলে, উহা দ্বারা উৎকৃষ্ট মানের 'হে' তৈরি করা সম্ভব।

(৫) কেয়ারিং অব হেঃ 'হে' তৈরির সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন অতিরিক্ত রোদে 'হে' এর কোন ক্ষতি না হয় এবং রোদে নাড়া-চাড়া করার সময় গাতা কম ঝড়ে পড়ে। তাছাড়া এমনভাবে রোদে শুকাতে হবে যাতে সর্বোচ্চ পরিমাণ পানি বের হয়ে যায় এবং 'হে' সংরক্ষণ করার পর কোন রকম তাপমাত্রার বৃদ্ধি না ঘটে ও পরবর্তীকালে পুষ্টিমান অপচয় কম হয়।

'হে' তৈরির জন্য ফসলকে কর্তন করার পর ফসলকে মাঠের মধ্যে বিছিয়ে রাখবে যাতে এক-চতুর্থাংশ থেকে এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ শুকিয়ে যায়। রোদে শুকানোর পর আচ্ড়া দিয়ে ছোট ছোট স্তুপ করতে হবে। আবহাওয়া ভাল থাকতে 'হে' ছোট ছোট স্তুপগুলো কিছু সময়ের জন্য ওলট-পালট করে দিতে হবে যাতে কিয়ারিং প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। এই কিয়ারিং প্রক্রিয়াকে ফিল্ড কিয়ারিং বলে।

তাছাড়া, কৃত্রিম ভাবেও 'হে' কে শুকানো যায়। এ পদ্ধতিতে 'হে' এর তৈরিকৃত একটি প্রকোষ্ঠের মধ্যে চালনা করা হয়, যার মধ্যে গরম বাতাস প্রবেশ করানোর ব্যবস্থা থাকে। গ্রীষ্মের সময়ে 'হে' তৈরির জন্য প্রস্তুত হলে সকাল বেলার রোদে ফসলকে শুকানো হবে এবং এতে পাতার অপচয় কম হবে। অধিক তাপমাত্রায় ফসলকে রোদে শুকালে, পাতা অতি তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় এবং এতে পাতা অপচয় বেশি হয় ও 'হে' এর পুষ্টিমান কমে যায়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'হে' কে গাজন এর হাত থেকে রক্ষা করতে হলে এবং অধিক সময় পর্যন্ত সংরক্ষণের জন্য আদ্রতার পরিমাণ সর্বোচ্চ শতকরা ২০ ভাগের কম থাকতে হবে।

'হে' তৈরির সময় পুষ্টিমানের অপচয়:

'হে' তৈরির সময় কিছু কিছু পুষ্টি উপাদান নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু উপযোগী অবস্থায় 'হে' তৈরি করলে এই অপচয়ের পরিমাণ কম হয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে, সাধারণ তাপমাত্রায় 'হে' তৈরি করলেও উহার পরিপাচ্যতা কমে যায়। সাধারণতঃ চারটি ভাগে 'হে' এর পুষ্টিমান নষ্ট হয়ে থাকে। যেমন-

১. ফসলকে অতি বয়স্ক অবস্থায় কর্তন করলে।
২. নাড়া-চাড়া অধিক হলে পাতার অপচয় বেশি হয়।
৩. ফারমেন্টেশন এবং বেঞ্চিং অধিক হলে ভিটামিনের অপচয় বেশি হয়।
৪. বৃষ্টির সময় 'হে' মাঠে থাকলে দ্রবণীয় পুষ্টি উপাদানের অপচয় হয়।

'হে' তৈরি ও সংরক্ষণের সময় জৈব-রাসায়নিক পরিবর্তন:

'হে' তৈরির জন্য ফসল কর্তন পর হঠাৎ করে প্রশ্বেদন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবার কারণে শিকড়ের মাধ্যমে পানি পাতায় সরবরাহ হতে পারে না ফলে পাতা অতি সহজেই নেতিয়ে পড়ে এবং পাতা শুষ্ক হয়ে যায়। ফসল শুকানোর পরও গাছের শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে জড়িত এনজাইমগুলোর কার্যকারিতা বজায় থাকার কারণে অনেক পুষ্টি উপাদনের অক্সিডেসন ঘটে থাকে। এ প্রক্রিয়া 'হে' হিসাবে সংরক্ষণ করার পরও ঘটতে পারে। 'হে' তৈরির সময় যে সমস্ত জৈব-রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে থাকে তা নিম্নরূপ:

(ক) শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের পরিবর্তন: শ্বেতসার জাতীয় উপাদানের মধ্যে যে সমস্ত উপাদান অতি সহজেই পানিতে দ্রবণীয় উহা অতি সহজেই কার্বন-ডাই অক্সাইড ও পানিতে অক্সাইড উপ-জাত হিসেবে নির্গমন ঘটে ফলে তাপ উৎপাদন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং এতে 'হে' তে শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ কমে যায়। শ্বেতসার জাতীয় উপাদনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজ। এ ছাড়াও কিছু কিছু অর্গানিক এসিড যেমন, ম্যালিক এসিড, সাইট্রিক এসিড এবং এসিটিক এসিড এসিডেরও পরিবর্তন ঘটে।

(খ) নাইট্রোজেনাস খাদ্য উপাদন: 'হে' তৈরির সময় নাইট্রোজেনাস পদার্থের তেমন কোন পরিবর্তন ঘটে না। প্রোটিনেজ এনজাইমের ক্রিয়ার ফলে অনেক সময় নন প্রোটিন নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে। তাছাড়া, ফসলের মধ্যে কোন বিষ জাতীয় পদার্থ থাকলে তা সূর্যের তাপে উহার কার্যকারীতা নষ্ট হয়ে যায় বিশেষ করে যে সমস্ত ঘাসের মধ্যে হাইড্রোসায়ানিক এসিড থাকে।

(গ) ভিটামিন জাতীয় উপাদান: 'হে' তৈরির সময় ভিটামিন জাতীয় উপাদানের মধ্যে সবচেয়ে যে উপাদানটি ক্ষতিগ্রস্থ তা হলো কেরোটিন। কেরোটিনের প্রায় ৮০ ভাগই নষ্ট হয়ে যায় উল্লেখযোগ্য কারণ হলো লাইবোক্সিডেজ এনজাইমের উপস্থিতি। কিন্তু 'হে' তৈরির সময়কে সংক্ষিপ্ত করলে এই অপচয়ের পরিমাণ কম হয়। তাছাড়া 'হে' এর মধ্যে ভিটামিন-ই এর পরিমাণ কমে যায় কিন্তু সূর্য তাপের আল্ট্রা ভায়োলেট রশ্মির উপস্থিতিতে আর্গষ্টেরন আরগোক্যালসিফেরন এ রূপান্তরিত হওয়ার কারণে ভিটামিন-ডি এর পরিমাণ বেড়ে যায়।

সংরক্ষণ:

'হে' প্রস্তুত করার পর শুকনা জায়গায় পালা দিয়ে সংরক্ষণ করা যায়। অথবা ঘরের মধ্যেও 'হে' সংরক্ষণ করা যেতে পারে। 'হে' কে পালা দিয়ে সংরক্ষণ করলে, ছায়াযুক্ত স্থান নির্বাচনপূর্বক পালা দিতে হবে। তাছাড়া, উন্নত পদ্ধতিতেও 'হে' কে সংরক্ষণ করা যায়; যেমন বেল তৈরি করা। 'হে' কে বেল তৈরি করে সংরক্ষণ করলে জায়গা কম লাগে এবং অতি সহজেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পরিবহন করা যায়।

হেঃ সংরক্ষণ

উপসংহার:

'হে' এর মাধ্যমে পশু খাদ্য সংরক্ষণ যদিও একটি প্রাচীন পদ্ধতি তবে বাংলাদেশের কিছু কিছু অঞ্চল ব্যতীত এর তেমন প্রচলন নাই। এই পদ্ধতিতে আঁশ জাতীয় খাদ্যকে সংরক্ষণ করলে বর্ষা মৌসুমে যখন গবাদিপশুর খাদ্যাভাব দেখা দেয় তখন 'হে' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে এবং খামারীরা উপকৃত হবে।

৫টি গাভীর জন্য ঘাসের প্রয়োজনীয়তা নির্ণয়

ধরা যাক, একজন খামারীর ৫টি গাভী ও ৫টি বাছুর আছে। গাভীটির ওজন ৩৫০.০ কিলো এবং বাছুরটির দুধ ছাড়ানোর পর এর গড় ওজন ৫০.০ কিলো। অতএব, খামারীকে মোট ৪০০ কিলো ওজনের জন্য ঘাস সংগ্রহ করতে হবে। খামারী যদি বন্যা কবলিত অঞ্চলের হয় তাহলে তাকে ন্যূনতম ৬ মাসের খাদ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে।

খামারীর ১টি গাভী ও ১টি বাছুর প্রতিদিন যে পরিমাণ ঘাস খাবে তা আমরা নিম্নলিখিত সমীকরণ থেকে পেতে পারি:

মাথাপিছু দৈনিক ঘাস গ্রহণ = ৪.৮৮+০.০৪৭৪০০ কিলো
= ৪.৮৮+১৮.৮০
= ২৩.৬৮ কিলো
অপচয়ের মাত্রা = ৩.৭৬-০.০০২৪০০ কিলো
= ৩.৭৬-০.৮
= ২.৯৬ কিলো

অর্থাৎ উক্ত খামারীর ১টি গাভী ও ১টি বাছুরের দৈনিক মোট ঘাসের দরকার হবে
= ২৩.৬৮+২.৯৬
= ২৬.৬৪ কিলো

অপচয় মাত্রা রোধ করা গেলে দৈনিক গড়ে ২৫.০ কিলো ঘাস প্রয়োজন হবে উক্ত খামারীর জন্য ৬×৩০=১৮০ দিনে সর্বমোট ঘাস প্রয়োজন হবে
= ১৮০×২৫
= ৪৫০০ কিলো
= ৪.৫ টন (প্রায়)

সুতরাং ৫টি গাভী ও ৫টি বাছুরের জন্য প্রয়োজন হবে প্রায় ২২.৫ টন কাঁচা ঘাস।

খামারী যদি উক্ত ঘাস সাইলেজ করতে প্রয়োজন বোধ করেন তা হলে ঘাসের গঠনের ভিত্তিতে ৭৫০-৮০০ ঘনফুট মাটির গর্তে উক্ত ঘাস সাইলেজ করা যেতে পারে। কারণ ঘাসের গঠন এবং সাজানোর উপর প্রতি ১০০ ঘন ফুট মাটির গর্তে ২.৫০-৩.০০ টন ঘাস সাইলেজ করা যায়। উক্ত পরিমাণ ঘাস সংগ্রহ করার জন্য খামারীর নিজের জমি, প্রাকৃতিক উৎস্য ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনা করতে পারেন।

উল্লেখিত হিসাবগুলো বিবেচনায় রেখে একজন খামারী সাইলেজ উৎপাদন করতে পারেন। এর ফলে তার সারা বছরের খাদ্য সংকট কিছুটা হলেও সমাধানে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

দুধ উৎপাদনে গাভীর খাদ্যে রাসায়নিক দ্রব্য, এন্টিবায়োটিক ও হরমোন ব্যবহারে প্রাণী ও জনস্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব

বাংলাদেশে দিনে দিনে গবাদি পশুর নিবিড় খামারের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি এর সাথে সাথে দেশি বিদেশি বিভিন্ন কোম্পানি গবাদি পশুর উৎপাদনে ব্যবহারের উদ্দেশ্য বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন, আমদানি ও বাজারজাত করছে। যুগ যুগ ধরেই উন্নত অনুন্নত সব দেশেই গবাদি পশুর উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এসব পণ্য ব্যবহার হয়ে আসছে। এসব পণ্য মূলত বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক ফিড এডিটিভ, এন্টিবায়োটিক বা ষ্টেরয়েড হরমোন। দুধ বা মাংস উৎপাদনে এসব পণ্যের ব্যবহারে কিছু সুবিধার দিক থাকলেও ক্ষতিকর অনেক দিকও রয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশে গো-খাদ্যে এন্টিবায়োটিক, ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও হরমোন ব্যবহার নিষিদ্ধ এবং আইনত দুনীয় অপরাধ। তাই এসব পণ্যের ব্যবহারে কিছুটা লাভ জড়িত থাকলেও এর ক্ষতিকর দিকগুলো এবং আইনগত বিষয়গুলো আমাদের জানা থাকা দরকার। নিম্নে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে কিছু আলোচনা করব।

খাদ্যে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদি, এন্টিবায়োটিক, হরমোন ও অন্যান্য ফীড এডিটিভ:

আয়োনোফোর (Ionophores): এগুলো এক ধরণের রাসায়নিক ফিড এডিটিভ যা গরুর খাদ্যে ব্যবহার হয়। মূলত গরুর রুমেনের (পাকস্থলী) কার্যাবলী পরিবর্তনের মাধ্যমে এসব পণ্য খাদ্য দক্ষতা (Feed Efficiency), দৈহিক ওজন ও দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি করে। মোনেনসিন (Monensin), ল্যাসালোসিড (Lasalocid), স্যালিনোমাইসিন (Salinomycin), নারাসিন (Narasin) ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের আয়োনোফোর। এগুলোকে এন্টিবায়োটিক শ্রেণীতেও ধরা হয়।

এন্টিবায়োটিকঃ মাংস বা দুধ উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন ধরণের এন্টিবায়োটিক সাব-থেরাপিউটিক লেভেলে, অর্থাৎ, চিকিৎসায় ব্যবহৃত মাত্রার চেয়ে কম মাত্রায় খাদ্যের সাথে বা ইঞ্জেকশনের ব্যবহার করা হয়। ক্লোরটেট্রাসাইক্লিন, পোরসেইন পেনিসিলিন, অক্সিটেট্রাসাইক্লিন, টাইলোসিন, বেসিট্রাসিন, নিওমাইসিন সালফেট, স্ট্রেপটোমাইসিন, ইরাইথ্রমাইসিন, লিনোমাইসিন ইত্যাদি কিছু প্রধান প্রধান এন্টিবায়োটিক যা গবাদিপশুর উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

হরমোনঃ মাংস ও দুধ উৎপাদন বাড়াতে হরমোন ইমপ্ল্যান্ট বা ইঞ্জেকশন ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ইমপ্ল্যান্ট হচ্ছে এক ধরণের হরমোন ট্যাবলেট/পিলেট যা কানের পিছনের চামড়ার নিচে স্থাপন করা হয় এবং যেখান থেকে অল্প অল্প করে হরমোন নিঃসৃত হয়ে রক্তে শোষিত হয়। উৎপাদন বাড়াতে মূলত এনাবলিক স্টেরয়েড হরমোন এবং গ্রোথ হরমোন ব্যবহার করা হয়। এনাবলিক স্টেরয়েড হরমোনগুলোকে দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়, যথাঃ প্রাকৃতিক ও সিনথেটিক/কৃত্রিম। প্রাকৃতিক স্টেরয়েড হরমোনগুলো হল এস্ট্রাডিওল, টেস্টোস্টেরন, প্রজেস্টেরন ইত্যাদি। সিনথেটিক হরমোনগুলোর মধ্যে রয়েছে এসট্রোজেন কম্পাউন্ড জেরানল, এনড্রজেন ট্রেনবোলন এসিটেট, প্রজেস্টিন মেলেনজেস্ট্রল এসিটেট ইত্যাদি। গ্রোথ হরমোন হিসাবে রিকম্বিন্যান্ট বোভাইন সোমাটোট্রোপিন (rbST) হরমোন ব্যবহার হয়। বোভাইন সোমাটোট্রোপিন (rbST) হরমোন দুধ উৎপাদন নিয়ন্ত্রন করে।

ভিটামিন/মিনারেল/এনজাইম/এপেটাইজার: বাংলাদেশে বাজারে সাধারণত অনেক ধরণের ভিটামিন, মিনারেল প্রিমিক্স, এনজাইম বা এপেটাইজার (ক্ষুধা বর্ধক) জাতীয় প্রোডাক্ট বিক্রি হয় যা গবাদিপশুর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ব্যাবহার করার কথা বলা হয়।

ক্ষতিকর দিকসমূহ:

০১. এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্সঃ খাদ্যে অব্যাহত এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন ধরনের জীবাণুর মাঝে এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স তৈরি হয়। অর্থাৎ ঐ এন্টিবায়োটিক প্রয়োগে আর ঐ জীবাণুগুলো দমন হয়না, আরও বেশী মাত্রার বা ভিন্ন শক্তিশালী এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করতে হয়। গো-খাদ্যে এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের ফলে গবাদিপশুর শরীরে যেমন এ ধরণের রেজিসটেন্স তৈরি হয়, তেমনি মাংস ও দুধের মাধ্যমে এন্টিবায়োটিকের পরিশিষ্ট মানবদেহে প্রবেশ করে মানুষের ক্ষেত্রেও রেজিসটেন্স তৈরি হয়। এজন্যই ইদানিং দেখা যায় যে, যে সকল অসুখ আগে স্বল্প মাত্রার এন্টিবায়োটিকেই সেরে যেত সে সকল অসুখ এখন অনেক উচ্চ মাত্রার এন্টিবায়োটিকেও সাড়তে চায়না।

০২. এলারজিঃ অনেক এন্টিবায়োটিক বা ড্রাগের পরিশিষ্ট শরীরে এলারজি তৈরি করতে পারে।

০৩. এন্টিবায়োটিক বা ড্রাগের পরিশিষ্ট কৌলিক বৈশিষ্টে পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

০৪. এন্টিবায়োটিক/ড্রাগের/হরমোন ব্যবহারের ফলে নানা ধরণের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য যেসব অঞ্চলে গবাদিপশুতে হরমোন প্রয়োগ করা হয় সেসব অঞ্চলে ব্রেস্ট ক্যান্সার, প্রোস্টেট ক্যান্সার, টেস্টিকুলার ক্যান্সার ও কোলন ক্যান্সারের প্রবনতা বেশি পরিলক্ষিত হয়।

০৫. হরমোনের ক্ষতিকর প্রভাব সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয় ভ্রুন ও অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের মাঝে।

০৬. যুক্তরাষ্ট্রে সাধারনত বীফ (গরুর মাংস) উৎপাদনে হরমোনের ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সেখানে এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, যেসব মায়েরা গরুর গোস্ত কম খান তাদের ছেলে সন্তানের বীর্যে বেশি গরুর গোস্ত খাওয়া মায়েদের ছেলে সন্তানের তুলনায় ২৫% বেশি শুক্রাণু আছে। আবার বেশি গরুর গোস্ত খাওয়া মায়েদের ছেলে সন্তানদের মাঝে ১৮% এর বীর্যে শুক্রাণুর ঘনত্ব বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী সাব-ফারটিলিটি লেভেলের নীচে অবস্থিত, যা অল্প খাওয়াদের তুলনায় ৩ গুণ বেশি।

০৭. সুষম খাদ্য সরবরাহ করলে ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স জাতীয় গ্রোথ প্রোমোটারগুলোর কোন প্রয়োজন নেই, বরং উৎপাদন খরচ বেড়ে যাবে।

০৬. খাদ্যে যে কোন রাসায়নিক/এন্টিবায়োটিক/হরমোনের ব্যবহার খাদ্য খরচ বাড়িয়ে দেয়। সুষম ও পরিমিত পরিমানে খাদ্য সরবরাহ সাপেক্ষেই এসব পদার্থ উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভুমিকা রাখে। শুধু সুষম ও পরিমিত পরিমানে খাদ্য সরবরাহের মাধ্যমেই খামারকে অনেক লাভজনক করা যায়।

০৭. ভোক্তা সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় গরুর খাদ্যে এন্টিবায়োটিকের ব্যাবহার বা দুধ বা দুগ্ধ পন্যে এন্টিবায়োটিক/হরমোন/কেমিক্যালের উপস্থিতির যে কোন খবর/গুজব ডেইরি ব্যবসায় বড় ধরণের খতির কারণ হতে পারে, যা অতি সম্প্রতি লক্ষ্য করা গেছে।

০৮. দুধে এন্টিবায়োটিক বা ড্রাগ পরিশিষ্টের উপস্থিতি দুগ্ধ পন্য উৎপাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষ করে পনির ও দই শিল্পে ক্ষতির কারণ হয়ে দারাতে পারে।

০৯. আমাদের দেশের অনেক অসাধু ব্যবসায়ী কিছু অসাধু চিকিৎসকের সহায়তায় গরু মোটাতাজাকরন প্রক্রিয়ায় কিডনি নষ্ট হয়ে যাওয়ার ইনজেকশন প্রয়োগ করে থাকে যাতে কিডনি নষ্ট হয়ে শরীরে পানি জমে গরুর দেহ ফুলে ওঠে, দেখতে অনেক মাংসল মনে হয়। এটা গরুর প্রতি অমানবিক আচরণ, কিডনি নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে যে কোন মুহূর্তে গরুমরে গিয়ে খামারীর অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ হতে পারে এবং এসব গরুর মাংস জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

টেবিলঃ দুধে এন্টিবায়োটিক পরিশিষ্টের সর্বোচ্চ মাত্রা (ইইউ)

এন্টিবায়োটিক	মাত্রা (মাইক্রোগ্রাম/কেজি)	এন্টিবায়োটিক	মাত্রা (মাইক্রোগ্রাম/কেজি)
বেঞ্জাইল পেনিসিলিন	৪	জেন্টামাইসিন	২০০
এম্পিসিলিন	৪	নিওমাইসিন	১০০
এমোক্সিসিলিন	৪	স্পাইরামাইসিন	২০০
টেট্রাসাইক্লিন	১০০	টাইলোসিন	১০০
অক্সিটেট্রাসাইক্লিন	১০০	ইরাইথ্রোমাইসিন	৪০
ক্লোরটেট্রাসাইক্লিন	১০০	কলিস্টিন	৫০
স্ট্রেপটোমাইসিন	২০০	সেফটিওফুর	১০০
ডাইহাইড্রোস্ট্রেপটোমাইসিন	২০০	নাইট্রোফুরান্স	০
সালফোনামাইডস	১০০	নাইট্রোমিডাজল	০
পলিমিক্সিন	৫০	ক্লোরাফেনিকল/নভোবায়োসিন	০

সূত্রঃ *Sachi et al. (2019). JAVAR 6(03): 315-332*

দুধে এন্টিবায়োটিক বা ড্রাগ পরিশিষ্ট বা কেমিক্যালের উপস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের উপায় {সূত্রঃ *Sachi et al. (2019). JAVAR 6(03): 315-332}*

- উন্নতমানের প্রযুক্তি ব্যবহার করে অল্প সময়ে সঠিকভাবে দুধে এন্টিবায়োটিক/রাসায়নিকের উপস্থিতি নির্ধারণের ব্যবস্থা করা।
- দেশব্যপি নিয়মিত নমুনা বিশ্লেষণ করে দুধে এন্টিবায়োটিক/রাসায়নিকের উপস্থিতি মনিটরিং করা।
- প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে এন্টিবায়োটিক পরিশিষ্ট দূর করা যায়-
  - ক) রেফ্রিজারেশনে পেনিসিলিন অকার্যকর হয়
  - খ) অধিকাংশ এন্টিবায়োটিক পাস্তুরাইজেশনে অকার্যকর হয়ে পড়ে
  - গ) কিছু এন্টিবায়োটিক আল্ট্রাভায়োলেট-রে রেডিয়েশনে ধ্বংস হয়।
- জনসচেতনতা বৃদ্ধি।
- ভেটেরিনারি এন্টিবায়োটিক ও কেমিক্যাল/ড্রাগের বিধিবহির্ভূত ব্যবহার শক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ।
- চিকিৎসা ও ফিড এডিটিভ হিসাবে ঔষধি/গাছ গাছালীর ব্যবহার।
- এন্টিবায়োটিকের সঠিক উইথড্রয়াল টাইম ব্যবহার করা।
- বায়োসিকুইরিটি ও উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার কমাতে হবে।
- এন্টিবায়োটিক চিকিৎসার আওতায় থাকা গাভীর দুধ পৃথকভাবে প্রক্রিয়াকরণ (যাতে পরিশিষ্ট অকার্যকর হয়) বা দুধ ফেলে দেয়া।

গবাদিপশুর খাদ্যে রাসায়নিক দ্রব্যাদি, এন্টিবায়োটিক ও হরমোন ব্যবহারের এসন ক্ষতিকর প্রভাবের কারণে এগুলোর ব্যবহার বন্ধের লক্ষ্যে তাই পশুখাদ্য আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০

উক্ত আইনের ১৪ নং ধারায় পশুখাদ্যে এন্টিবায়োটিক, গ্রোথ হরমোন, কীটনাশক, ইত্যাদি ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

> ১৪ (১) মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্যে এন্টিবায়োটিক, গ্রোথ হরমোন, স্টেরয়েড ও কীটনাশকসহ অন্যান্য ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা যাইবে না
> (২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে উহা এই অধ্যাদেশের অধীন অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে

এই আইনে উল্লেখিত দণ্ড

> ২০। যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ করেন তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনুরূপ অপরাধের জন্য অনূর্ধ্ব এক বৎসরের কারাদণ্ড, বা অনূর্ধ্ব ৫০০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত অর্থণ্ড, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

অর্থদন্ড আরোপের ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের বিশেষ ক্ষমতা

> ২১। ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য এই আইনে অনুমোদিত যে কোন দন্ড আরোপ করিতে পারিবে।

এছাড়াও, ২০১৩ সালে নিরাপদ খাদ্য আইন করা হয়েছে। দুধে এন্টিবায়োটিক বা ক্ষতিকর কেমিক্যালের উপস্থিতি পাওয়া গেলে এই আইনের অধীনেও কোন ব্যক্তি দণ্ডপ্রাপ্ত হতে পারে। এই আইনের সংশ্লিষ্ট কিছু ধারা ও তফসিল নিম্নে উল্লেখ করা হল।

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩

৩০। বৃদ্ধি প্রবর্ধক, কীটনাশক, বালাইনাশক বা ঔষধের অবশিষ্টাংশ, অণুজীব, ইত্যাদির ব্যবহার। কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, প্রবিধান দ্বারা বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন নির্ধারিত মাত্রার অতিরিক্ত পরিমাণ কীটনাশক বা বালাইনাশকের অবশিষ্টাংশ পশু বা মৎস্য রোগের ঔষধের অবশিষ্টাংশ, হরমোন এন্টিবায়োটিক বা বৃদ্ধি প্রবর্ধকের অবশিষ্টাংশ, দ্রাবকের অবিশিষ্টাংশ, ঔষধপত্রের সক্রিয় পদার্থ, অণুজীব বা পরজীবী কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার বা অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন না বা উক্তরূপ দ্রব্য মিশ্রিত কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ মজুদ, বিপণন বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

৩৩। মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিবেচিত প্রক্রিয়ায় খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, বিক্রয়, ইত্যাদি। কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে নিয়োজিত অন্য কোন ব্যক্তি প্রবিধান দ্বারা বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীন নির্ধারিত স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সংরক্ষণ বা প্রক্রিয়া অনুসণের মানদণ্ড ও শর্তের ব্যত্যয় ঘটাইয়া মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হইতে পারে এইরূপ কোন প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

৬০। জামিনযোগ্যতা ও আমলযোগ্যতা। এই আইনের ধারা ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬ ও ৩৭ এ বর্ণিত অপরাধ আমলযোগ্য (cognizable) ও অজামিনযোগ্য (non-bailable) হইবে এবং উক্ত অপরাধ ব্যতীত এই আইনের অন্যান্য অপরাধ অ-আমলযোগ্য (non-cognizable) ও জামিনযোগ্য (bailable) হইবে।

তফসিল
(ধারা ৫৮ দ্রষ্টব্য)

ক্রমিক নং	ধারা	অপরাধের বিবরণ	প্রথমবার অপরাধ সংঘটনের জন্য আরোপযোগ্য দণ্ড	পুনরায় একই অপরাধ সংঘটনের জন্য আরোপযোগ্য দণ্ড
১	২	৩	৪	৫
(১)	২৩	মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অথবা বিষক্রিয়া সৃষ্টিকারী রাসায়নিক দ্রব্য বা উহার উপাদান বা বস্তু, কীটনাশক বা বালাইনাশক, খাদ্রের রঞ্জক বা সুগন্ধি বা অন্য কোন বিষাক্ত সংযোজন দ্রব্য বা প্রক্রিয়া সহায়ক কোন খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণে ব্যবহার বা অন্তর্ভুক্তি অথবা উক্তরূপ দ্রব্য মিশ্রিত খাদ্যদ্রব্য বা খাদ্যোপকরণ মজুদ, বিপণন বা বিক্রয়।	অনূধর্ব পাঁচ বৎসর কিন্তু অন্যূন চার বৎসর কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব দশ লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।	পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড বা বিশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড

দুগ্ধ উৎপাদনকারী গাভীর খাদ্য উপাদানসমূহ ও সুষম খাদ্য প্রস্তুতকরণ

বাংলাদেশের দুগ্ধখামারী বেশীরভাগই ক্ষুদ্র থেকে মাঝারী ধরনের। যেসব খামারী ১-৫ টি গরু পালন করে তারা ক্ষুদ্র খামারী পর্যায়, যেসব খামারী ৫-১০ টি গাভী পালন করে তাদেরকে মাঝারি ও ১০ এর অধিক গাভী পালন করলে বড় বা বানিজ্যিক খামারির পর্যায়ে ধরা হয়। এখানে মুলতঃ ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়ের খামারের গাভী পালনের খাদ্য ব্যস্হাপনা বিষয়ে আলোকপাত করা হবে।

দুধালো গাভী পরিমানমত গুণগতমান সম্পন্ন খাদ্য পেলে অধিক উৎপাদনশীল হবে। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারী পর্যায়ের খামারীর ক্ষেত্রে খাদ্য খরচ ৬০-৭৫%। সুতরাং দুগ্ধ খামারে প্রয়োজন অনুসারে সময়মত খাদ্য তৈরী ও সরবরাহ, স্বল্পমূল্যে ও সঠিক পদ্ধতিতে না হলে ও শিল্প হতে মুনাফা অর্জন কঠিন হয়ে পড়বে। সর্বনিন্ম খরচে পর্যাপ্ত পুষ্টি সরবরাহ নিশ্চিত করার পাশাপাশি সঠিক পরিমাণ সুষম খাদ্য সরবরাহ করাই হলো দুগ্ধ খামারীদের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ। অতএব লাভজনকভাবে দুগ্ধ খামার পরিচালনা করার জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে সুষম খাদ্য সরবরাহ করা একান্ত জরুরী।

সাশ্রয়ী মূল্যে সুষম খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য নিন্ম লিখিত বিষয়ে জানা প্রয়োজন।

১। খাদ্যের শ্রেণী বিভাগ

২। খাদ্য উপাদান

৩। খাদ্যে পুষ্টি উপাদান ও পুষ্টি উপাদানের প্রয়োজনীয়তা সমূহ

৪। পুষ্টি উপাদানের উৎসসমূহ

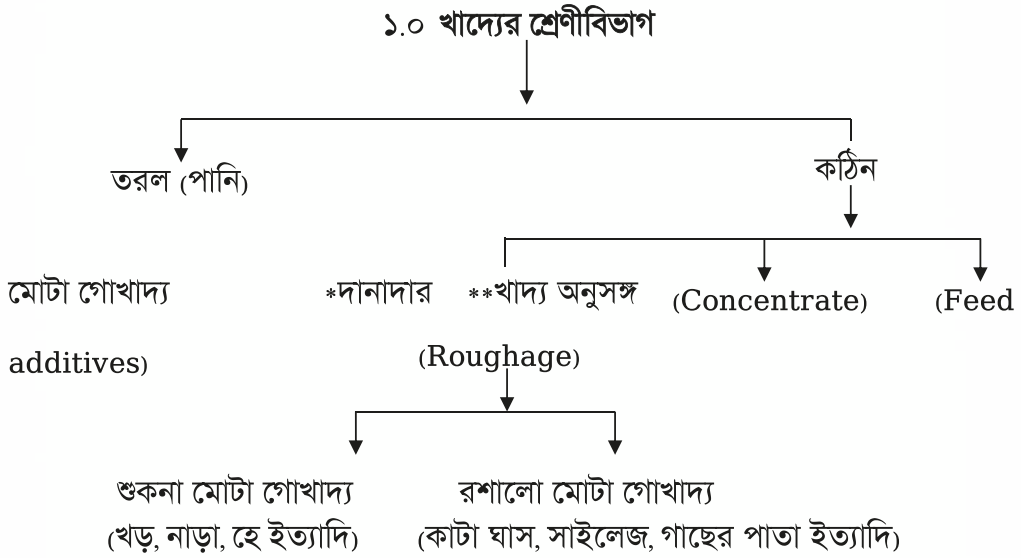

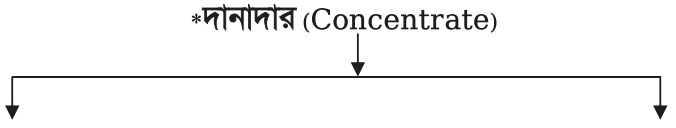

(প্রাণীজ উৎসঃ মাছের গুড়া, হাড়ের গুড়া, নাড়ীভূড়ি, রক্ত ইত্যাদি) (উদ্ভিজ্জ উৎসঃ ভূট্টা ভাঙ্গা, তেলের খৈল ইত্যাদি)

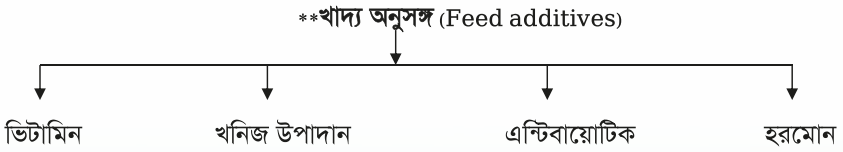

২.০ দুগ্ধ উৎপাদনকারী গাভীর খাদ্য উপাদানসমূহ

ক) বিভিন্ন ধরণের খড়সমূহ: ধানের খড়, গমের খড়, মেইজ (ভূট্টা) স্টোভার, ওট ঘাসের খড়, সয়াবিন খড়, ইউএমএস, ইউরিয়া প্রক্রিয়াজাত খড়, ইক্ষুর ডগা ইত্যাদি।

খ) বিভিন্ন ধরণের ঘাসসমূহ:

- **বহুবর্ষজীবি ঘাস-** নেপিয়ার, পারা, এন্ড্রোপোগন, পাচপালুম, পিকাটুলাম, স্পেন্ডিডা, রোজী, গিনি, সেতারিয়া, সিগনাল, বাকশা ইত্যাদি।
- **একবর্ষজীবি ঘাস-** ভূট্টার কচি গাছ, ভূট্টার সাইলেজ, যোয়ার ঘাস ও সাইলেজ, ওট ঘাস ইত্যাদি।
- **ডালজাতীয় ঘাসসমূহ-** মাসকালাই, খেসারী, কাউপি, ধইঞ্চা, ইপিল ইপিল, অরহর, মটর ইত্যাদি।

ভূট্টা ভাঙ্গা

গমের কুড়া

চালের কুড়া

খৈল

গ) দানাদার খাদ্যঃ

- **শর্করা জাতীয়-** গম ভাঙ্গা, ভূট্টা ভাঙ্গা, চাল ভাঙ্গা, গমের ভূষি, চালের কুড়া, ছোলার ভুষি, খেসারী ভূষি, মসুরের ভূষি, মোলাসেস ইত্যাদি।
- **আমিষ জাতীয়-** তিলের খৈল, সরিষার খৈল, সয়াবিন মিল, মাছের গুড়া ইত্যাদি

৩. খাদ্যে পুষ্টি উপাদান ও পুষ্টি উপাদানের প্রয়োজনীয়তা সমূহ

ক) শর্করা (Carbohydrate)
খ) আমিষ (Protein)
গ) চর্বি (Fat/Lipid)
ঘ) ভিটামিন (Vitamin)
ঙ) খনিজ (Mineral)
চ) পানি (Water)

রোমন্থক প্রানীর খাদ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে শর্করা/শক্তি, আমিষ, ভিটামিন, খনিজ ও পানির পরিমান বিবেচনা করা অত্যাবশ্যকীয়।

পুষ্টি উপাদানের সংক্ষিপ্ত প্রয়োজনীতা তুলে ধরা হল:

ক) শর্করাঃ শর্করা পুষ্টি উপাদান সমূহের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। দেহ রক্ষনাবেক্ষন, দৈনন্দিন কাজ ও দুগ্ধ উৎপাদনের জন্য শর্করা প্রয়োজন।

খ) আমিষঃ দৈহিক বৃদ্ধি, গর্ভাবস্থায় বাচ্চার বৃদ্ধি ও দুধ উৎপাদনের জন্য আমিষজাতীয় খাদ্যের গুরুত্ব অপরিসীম।

গ) ভিটামিনঃ খাদ্য হজম, বিপাক ক্রিয়ায় সাহায্য করে এবং ভিটামিনের অভাবজনিত রোগ থেকে দেহকে রক্ষা করা।

ঘ) খনিজঃ হাড়ের বৃদ্ধি ও রক্ষণাবেক্ষন, গর্ভবস্থায় বাচ্চার বৃদ্ধি এবং দুধ উৎপাদনের জন্য গাভীর খাদ্যে পরিমানমত খনিজ থাকা অত্যাবশ্যকীয়।

ঙ) পানিঃ প্রাণীদেহে সকল পুষ্টি উপাদানের সঠিকভাবে কাজ করার জন্য পানি আবশ্যক। গাভীর শরীরের রক্ষনাবেক্ষন ও দুধ উৎপাদনের জন্য পানির প্রয়োজন হয়। এছাড়া, পানি দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রনসহ পুষ্টিপরিবহনে সাহায্য করে।

৪.০ পুষ্টি উপাদানের উৎসসমূহঃ

পুষ্টি উপাদানের প্রকার	পুষ্টি উপাদানের উৎস
শর্করা/শাক্তি	• বিভন্ন ধরনের খড়, হে, সাইলেজ ও কাঁচা ঘাস • দানাদার শস্য উপজাত যেমনঃ গম ভাঙ্গা, ভুট্টা ভাঙ্গা, চাল ভাঙ্গা, • গমের ভূষি, চালের কুড়া ইত্যাদি • মোলাসের • তৈল যেমনঃ সোয়াবিন
আমিষ	• সবুজ ডাল জাতীয় যেমন: খেসারী, মুগবিন, মাসকালাই ইত্যাদি • বিভিন্ন ধরনের খৈল: সরিয়া, তিল, তিসি, নারিকেল, সোয়াবিনও তুলাবীজ খৈল • বিভিন্ন ধরনের ডালের ভূষি • সয়াবিন মিল
খনিজ	• ডাই ক্যলসিয়াম ফসফেট • ঝিনুকের গুড়া
পুষ্টি উপদানের প্রকার	পুষ্টি উপাদানের উৎস
	• লবন • চুনাপাথর • খনিজ মিশ্রন
ভিটামিন	• সবুজ ঘাস

গাভী পালনে দানাদার খাদ্যের বিভিন্ন উৎস, উপাদান এবং খাদ্য মিশ্রনের ব্যবহারের শতকরা হার

ক্রমিক নং	প্রধান উৎস	উপাদান	মিশ্রন তৈরীতে শতকরা হার
১.০	শক্তি এবং আমিষ	শস্য বীজঃ চাল ভাঙ্গা, গম ভাঙ্গা, ভূট্টা ভাঙ্গা	০-৫০%
২.০	শক্তি এবং আমিষ	ভূষি জাতীয়ঃ চালের কুড়া, গমের ভূষি, মাসকালাই/খেসারী/মসুর/মুগ ডালের ভূষি	২৫-৫০%
৩.০	আমিষ	খৈলঃ তিলের খৈল, সরিষার খৈল, সয়াবিন খৈল, নারিকেল খৈল	১৫-২৫%
৪.০	আমিষ	প্রানীজাত খাদ্যঃ ফিস মিল এবং প্রোটিন কনসেনট্রেট	০-৫%
৫.০	খনিজ	লবন, ডাই ক্যালসিয়াম ফসফেট, ঝিনুকের গুড়া এবং ডিমের খোসার গুড়া	০-৩%
৬.০	ভিটামিন	ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০-০.৫%

দুধ উৎপাদনশীল গাভীর খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ

খামারীরা গাভী পালন করেন দুধ উৎপাদন করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য। ডেয়রি খামারে দুধ উৎপাদন খরচের মধ্যে খাদ্য খরচ সবচেয়ে বেশী। তাই গাভীর দুধ উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য উন্নত খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রতি নজর দিতে হবে। গাভীর খাদ্যে অধিক পরিমান উন্নতমানের আঁশ জাতীয় খাদ্য সরবরাহ করার মাধ্যমে পুষ্টির চাহিদা পূরণ করতে পারলে অল্প পরিমান দানাদার মিশ্রণ সরবরাহ প্রয়োজন হয়। ফলে দুধ উৎপাদন খরচ কমে যায়। ডেয়রী খামারে দুধালো গাভী, বাছুর, বাড়ন্ত গরু (বকনা/ ষাঁড়) খাদ্য ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

ডেয়রী খামার লাভজনক করতে হলে গাভীর খাদ্য ব্যবস্থাপনায় দুধ উৎপাদনের ধাপসমূহকে বিবেচনায় আনতে হবেঃ

দুধ উৎপাদন কালের ধাপসমূহ

বাংলাদেশে একটি ভাল দুধালো গাভী গড়ে ২৮০-২৯০ দিন দুধ দেয় এবং পরবর্তী ৬০ দিন শুষ্ক অবস্থায় থাকে। গাভীর দুধ উৎপাদন চক্রকে ৫ টি পর্যায়ে ভাগ করা যায়।

পর্যায়/ধাপ	সময় কাল	
পর্যায়-১/ধাপ	০-৩ মাস	
পর্যায়-২	৩-৬ মাস	সর্বোচ্চ দুধ উৎপাদন
পর্যায়-৩	৬-৮ মাস	
পর্যায়-৪	শুষ্ক পর্যায়	
পর্যায়-৫	গর্ভধারণ থেকে বাচ্চা প্রসব পর্যন্ত	

সারণী ১: বিভন্ন পর্যায়ে দুধ উৎপাদনশীল গাভীর জন্য দানাদার খাদ্য মিশ্রণ সমূহঃ

খাদ্য উপকরণ	১	২	৩	৪	৫	৬
ভুট্টা দানা	৪৮	৪৫	৪২	১৫	২৯	৪৪
চালের কুড়া/গমের ভূষি/ ডালের ভূষি	৩০	৩৫	৩৩	৪৫	৪৪.২৫	৩০
সয়াবিন মিল (৪৪%)	১০	৯	১৪	১৪	৫	১৪.২৫
সরিষা/ তিলের খৈল	১০.৫	১০	১০	২৫	২০	১০
ড্রাই ক্যালসিয়াম-ফসফেট	১	১	১	১	১	১
লবণ	০.২৫	০	০	০	০.৫	০.৫
ভিটামিন-খনিজ লবন মিশ্রণ	০.২৫	০	০	০	০.২৫	০.২৫
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

দুগ্ধবতী গাভীর পুষ্টির চাহিদাঃ

দুধ উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে গাভীর পুষ্টির চাহিদাঃ

পুষ্টি উপাদান	দুগ্ধদান কালীন অবস্থা			শুষ্ক অবস্থা	
	ধাপ ১	ধাপ ২	ধাপ ৩	ধাপ ৪	ধাপ ৫
বাচ্চা প্রসবের পরবর্তী মাস	০-৩	৩-৬	৬-১০	শুষ্ক অবস্থা	গর্ভধারণ থেকে বাচ্চা প্রসব পর্যন্ত
অশোধিত আমিষ (শুষ্ক পদার্থের ভিত্তিতে)	১৪.৫-১৮.৫	১৪.০-১৬.০	১৪.০-১৫.০	১২.০-১৪.০	১৪.০-১৫.০
ঘাসের: দানাদার অনুপাত (ন্যূনতম শতকরা হার)	৪৫:৬৫	৫০: ৫০	৫৫:৪৫	৬০:৪০	৬০:৪০

প্রজনন উপযোগী বকনা ও ষাঁড় এর খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রতিপালন (১দিন থেকে বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত)

বাছুর লালন পালনের গুরুত্ব : বাছুর উন্নয়নকে সাধারণতঃ দলের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কারণ, আজকের বাছুর আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। বাছুর লালন-পালন যদি যথাযথ না করা হয় তবে ভবিষ্যৎ উৎপাদন হ্রাস পাবে। একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গাভীর উৎপাদন ক্ষমতা বজায় থাকে। পর্যায়ক্রমে উন্নত জাত এবং উৎপাদনশীল গাভী দ্বারা কম উৎপাদনশীল গাভীকে অপসারণের মাধ্যমেই উচ্চ উৎপাদনশীল দল গঠন করা সম্ভব। তাই বাছুর লালন-পালন অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

বাছুরের রসদ তৈরী : বয়সের ভিত্তিতে বাছুরের রসদ তিন প্রকার হতে পারে।

শাল-দুধ খাওয়ানোকাল : এ সময় প্রায় এক সপ্তাহ। এ সময় বাছুর প্রয়োজনমত ক্লোস্ট্রাম বা কাঁচি দুধ খাবে। অন্য কোন খাবার না দিলেও চলবে।

বাছুরের খাওয়ানো পদ্ধতি :

বাছুর জন্মের পরপরই বাছুরের ব্যবস্থাপনা এবং খাবার প্রণালী নিম্নরূপ :

- বাছুরের জন্মের পরপরই ফিটাল মেমব্রেন ও শ্লেষ্মা নাক মুখ থেকে সরিয়ে নেয়া উচিৎ।
- জন্মের পরপরই বাছুরকে মায়ের শাল দুধ (কলস্ট্রাম) খাওয়াতে হবে।

শাল দুধ খাওয়ানোর নিয়ম হলো দৈনিক প্রতি ১০০ কেজি ওজনের জন্য ১০ কেজি অর্থাৎ ২০-২৫ কেজি ওজনের বাছুরের জন্য দৈনিক ১.২-১.৫ কেজি শাল দুধ খাওয়াতে হবে। অবশ্যই আধ ঘন্টা থেকে ১ ঘন্টার মধ্যে এই দুধ খাওয়ানো শুরু করা উচিৎ। এই দুধ খাওয়ালে বাছুরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বাছুরকে প্রথম দিন উপরোক্ত নিয়মে খাওয়ানোর পর পরবর্তী প্রায় তিন মাস পর্যন্ত নিম্নের ছকে বর্ণিত খাবার পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের সময় : আমাদের দেশে এ সময়টি ১ সপ্তাহ বয়স হতে দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত (৫-৬ মাস) হতে পারে। এ সময় বাছুরকে কাফ স্টার্টার দেয়া উচিৎ। দুধ খেলে ভিটামিন না দিলেও চলবে। এ সময় বাছুরকে পরিমানমত উন্নতমানের আশ জাতীয় খাবার সরবরাহ করতে হবে। কাফ স্টার্টারের নিম্নলিখিত পুষ্টি উপাদানসমূহ থাকতে হবে।

সারণী ২ : কাফ স্টার্টারের পুষ্টি উপাদান

পুষ্টি উপাদান	পরিমান (%)
আমিষ	১৬-১৮
আশজাতীয় খাবার	৭-১০
ক্যালসিয়াম	০.৬-০.৭
ফসফরাস	০.৪-০.৫

দুধ ছাড়ানোর পরবর্তীকাল : ট্রানজিশন পিরিয়ডের মাঝামাঝি হতে বাছুরকে ক্রমে ক্রমে আশ জাতীয় খাদ্য নির্ভর করতে হবে এবং এ সময়ে পুরোপুরি আশ জাতীয় খাদ্য নির্ভর হবে এবং সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ দানাদার খাদ্যের মিশ্রণ সরবরাহ করতে হবে। বাছুরের এ সময়ের রসদ বাড়ন্ত গরুর অনুরূপ হবে।

সারণী ৩ : জন্মের পর হতে তিন মাস বয়স পর্যন্ত বাছুরকে খাওয়ানোর নিয়ম :

বয়স (সপ্তাহ)	প্রতি ১০০ কেজি ওজনের জন্য দুধ	প্রতি ১০০ কেজি ওজনের জন্য দানাদার	কচি ঘাস/ইউএমএস
১-২	১০	সামান্য পরিমান	সামান্য পরিমান
৩-৪	৮	০.৫	সামান্য পরিমান
৫-৬	৬	১.০	প্রচুর পরিমান
৭-৮	৪	১.৫	প্রচুর পরিমান
৯-১০	২	২.০	প্রচুর পরিমান
১১-১২	০	২.৫	প্রচুর পরিমান

দুধ খাওয়ানো : সাধারণতঃ প্রতি ১০০ কেজির ওজনের জন্য ৮ কেজি পরিমাণ দুধ খাওয়ানো উচিৎ। অর্থাৎ ৪০ কেজি ওজনের বাছুরের জন্য প্রায় ৩-৩.৫ কেজি দুধ খাওয়ানো উচিৎ। উপরোক্ত নিয়মানুসারে প্রায় তিন মাসের মধ্যে বাছুরকে দুধ ছাড়ানো যায়। এরপরও দুধ খাওয়ালে কোন অসুবিধা নেই। তবে এ সময় বেশি দুধ খাওয়ানোতে আর্থিক অপচয় হয়। আমাদের দেশে বাছুরকে গড়ে ৬ মাস থেকে ১ বছরের মধ্যে দুধ ছাড়ানো হয়।

বাছুরের দানাদার খাদ্য : এই দানাদার মিশ্রণ কম আঁশ যুক্ত এবং উচ্চ প্রোটিন ও উচ্চ শক্তি সম্পন্ন হতে হয়। এইরূপ দুটি ফর্মুলা নিচে দেয়া হলো।

বাছুর দুধ পান করছে

সারণী ৪ : বাছুরের জন্য কাফ ষ্টার্টার (% হিসাবে)

উপাদান	১ নং	২ নং
গমের ভূষি	২৫	-
গম/চাল ভাংগা	২০	২০
মাসকলাই/খেসারী ভাংগা	২৫	২৫
তিলের খৈল	১৫	-
নারিকেলের খৈল	-	১৫
ঢেঁকি ছাটা চালের কুড়া	-	২৫
শুটকি মাছের গুড়া	৭	৭
চিটাগুড়	৫	৫
লবণ	১.৫	১
ঝিনুক/হাঁড়ের গুড়া	১	১.৫
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫	০.৫
মোট	১০০	১০০

খাদ্য সরবরাহের ভিত্তিতে বাছুরের বয়সকালকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়ঃ-

(ক) ক্লোস্ট্রাম ফিডিং পিরিয়ড

- বাছুর প্রয়োজন মাফিক ক্লোস্ট্রাম খাবে। অন্য কোন খাদ্য সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা নেই। এ সময় জন্ম থেকে ৭ দিন পর্যন্ত হয়ে থাকে।

(খ) সাকলিং পিরিয়ডঃ

আমাদের দেশে এ সময়কাল সাধারণত ১৮০ দিন বাছুরের বয়স পর্যন্ত ধরা যেতে পারে

- মায়ের সহিত থেকে পরিমাণ মত দুধ খাবে
- কাফ স্টার্টার (শতকরা ১৬-১৮ ভাগ আমিষ, ৭.১০ ভাগ আঁশ, ০.৬-০৭ ভাগ ক্যালসিয়াম, ০.৪-০৫ ভাগ ফসফরাস, ০.১৫-০.২০ ভাগ ম্যাগনেসিয়াম এবং ০.০৭-০.০৮ ভাগ সোডিয়াম থাকা আবশ্যক) খেতে দিতে হবে।
- পরিমাণ মত উন্নত মানের ঘাস/হে সরবরাহ করতে হবে।

(গ) পোষ্ট উইনিং পিরিয়ড

- তিন মাস বয়স হতেই বাছুরকে আঁশ জাতীয় খাদ্যে অভ্যস্থ করতে হবে।
- নির্দিষ্ট পরিমাণ উন্নতমানের দানাদার মিশ্রণ সরবরাহ করতে হবে।
- আস্তে আস্তে বাড়ন্ত গরুর খাদ্যে রূপান্তর করতে হবে।

সারণী -৫ : বাছুরের তিন মাস বয়স পর্যন্ত খাদ্য তালিকা।

বয়স	দুধ (কিলো)	স্কীম মিল্ক (কেজি)	কাফ-ষ্টার্টার (গ্রাম)	কাঁচিঘাস/হে (গ্রাম)	দৈনিক খাদ্য সরবরাহ
প্রথম তিন দিন	২.৫০ (কলোস্ট্রাম)	-	-	-	৩ বার
৪র্থ—৭ম দিন	২.৫০	-	-	-	৩ বার
২য় সপ্তাহ	৩.০০	-	৫০	২৫০	২ বার
৩য় সপ্তাহ	২.২৫	-	১০০	৩৫০	২ বার
৪র্থ সপ্তাহ	৩.০০	-	৩০০	৫০০	২ বার
৫ম সপ্তাহ	১.৫০	১.০০	৪০০	৫০০	২ বার
৬ষ্ট সপ্তাহ	-	২.৫০	৬০০	৬০০	২ বার
৭ম সপ্তাহ	-	২.০০	৭০০	৭০০	২ বার
৮ম সপ্তাহ	-	১.৭৫	৮০০	৮০০	২ বার
৯ম সপ্তাহ	-	১.২৫	১০০০	১০০০	২ বার
১০ম সপ্তাহ	-	-	১২০০	১১০০	২ বার
১১ শ সপ্তাহ	-	-	১৩০০	১২০০	২ বার
১২শ সপ্তাহ	-	-	১৪০০	১৪০০	২ বার
১৩ শ সপ্তাহ	-	-	১৭০০	১৯০০	২ বার

দৈহিক ওজনের ভিত্তিতে দুধ সরবরাহ

- প্রথম তিন সপ্তাহ দৈহিক ওজনের ১/১০ অংশ
- পরবর্তী দুই সপ্তাহ দৈহিক ওজনের ১/১৫ অংশ
- পঞ্চম সপ্তাহের পর দৈহিক ওজনের ১/২০ অংশ

অতিরিক্ত দুধ সরবরাহ করা হলে বাছুরের পেট খারাপ হয় এবং বাছুর দুর্বল হয়ে পড়ে। এ সময় সজাগ দৃষ্টি না রাখলে বাছুর অন্যান্য জীবাণু কর্তৃক আক্রান্ত হতে পারে।

কৃষক পর্যায়ের সমস্যা

এ পর্যায়ে যতদিন গাভীর দুধ পর্যাপ্ত থাকে ততদিন বাছুর প্রয়োজন মাফিক দুধ পায়। গাভীর দুধ উৎপাদন সাধারণত ৬ মাসের পর কমে যায় এবং কৃষকও বাছুরের দুধ পান সীমিত করে দেয়। কিন্তু এ বয়সে বাছুরের উন্নত মানের আঁশ জাতীয় ও দানাদার খাদ্য প্রয়োজন হলেও কৃষক খেয়াল করেন না। বাছুর যে সমস্ত খাদ্য পায় তার মধ্যে অন্যতম থাকে খড় জাতীয় যা নিম্নমানের খাদ্য। ফলে বাছুর আস্তে আস্তে অপুষ্টিতে ভূগতে শুরু করে।

খামার পর্যায়ের সমস্যা

খামারে এক সাথে অনেক বাছুর রাখা হয় এবং দুধ উৎপাদনকে বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোন থেকে দেখা হয়। ফলে প্রায়ই বাছুরের দুধ সরবরাহ হ্রাস পায়, অধিক দুধ উৎপাদনশীল গাভীর দুধ হাতে দোহানের ফলে বাছুর প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুধ পান করে। ফলে বাছুরের অনেক সময় পেট খারাপ হয়। এতে আক্রান্ত বাছুরটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। একটি বাছুর অসুস্থ হলে অন্যগুলো অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

সারণী - ৬ : বয়স বাড়ার সাথে সাথে বাছুরের খাদ্য পরিবেশন।

বাছুরের বয়স (সপ্তাহ)	পরিবেশন যোগ্য খাদ্য উপাদান
১৩-১৬	দিনে দু'বার দুধ পান করাতে হবে। একই সাথে মাথাপিছু ৫০০ গ্রাম দানাদার ও ১.০ কিলো সবুজ ঘাস খাওয়াতে হবে।
১৭-২০	দুধ পান দিনে দু'বার। একই সাথে মাথাপিছু ৭৫০ গ্রাম ও ৩.০ কিলো সবুজ ঘাস পরিবেশন করতে হবে।
২১-২৪	দুধ পান দিনে দু'বার। একই সাথে ১.০ কিলো দানাদার খাদ্য ও ৫.০-৭.০ কিলো সবুজ ঘাস দিতে হবে।
২৫-৩৫	দুধ পান বন্ধ করতে হবে। কিন্তু ১.০-১.৫ কিলো দানাদার খাদ্য ৫.০-৭.০ কিলো সবুজ ঘাস ও ১.০-২.০ কিলো খড় খাওয়াতে হবে।
৩৬-৫০	১.৫-২.০ কিলো দানাদার খাদ্য ১০.০-১২.০ কিলো সবুজ ঘাস ও ২.০-৩.০ কিলো খড় খাওয়াতে হবে।

বাড়ন্ত গরুর খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ

বাছুরের বয়স মোটামোটি ৬ মাস বয়সের পর থেকে বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত মোটামুটি তাদের ওজনের ১% হারে দানাদার খাবারের সাথে ইউ,এম,এস বা মোলাসেস খড় বা সাইলেজ বা সবুজ ঘাস বা ইউরিয়া দ্বারা সংরক্ষিত খড় খাওয়ালে মোটামোটি ভাল দৈহিক ওজন বৃদ্ধি আশা করা যায়। এ সময়ে গরুকে খাওয়ানোর জন্য যে বিভিন্ন প্রকার দানাদার মিশ্রণ হতে পারে তার একটি তালিকা ৭ নং সারণীতে দেয়া হলো (এক কেজি মিশ্রনের পরিমাণ)।

সারণী - ৭ : বাড়ন্ত/বয়স্ক গরুর জন্য সম্ভাব্য দানাদার খাদ্য মিশ্রণ (গ্রাম)।

উপাদান	মিশ্রন-১	মিশ্রন-২	মিশ্রন-৩	মিশ্রন-৪	মিশ্রন-৫
চালের খুদ	-	-	-	২০০	১০০
গম ভাঙ্গা	-	১৫০	১৫০	-	-
খেসারী ভাঙ্গা	-	-	-	-	২৫০
গম ভূঁষি	৫৪০	২৫০	২৫০	১৫০	১৫০
চালের কুঁড়া	-	৩০০	৩০০	২০০	২৫০
খেসারীর ভূঁষি	২০০	১০০	১০০	-	-
মসুরের ভূঁষি	-	-	-	২৪০	-
তিলের খৈল	১৫০	-	-	১৫০	-
নারিকেলের খৈল	-	-	-	-	২০০
সরিসার খৈল	-	১৪০	১৪০	-	-
শুটকি মাছের গুঁড়ো	৮	৫০	৫০	৫০	৫০

উপাদান	মিশ্রন-১	মিশ্রন-২	মিশ্রন-৩	মিশ্রন-৪	মিশ্রন-৫
লবণ	৫	৫	৫	৫	৫
ঝিনুকের গুঁড়া	৫	৫	৫	৫	৫
মোট	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০	১০০০
পুষ্টিমান এম ই (মেগাজুল প্রতি কেজি)	১০.৭১	১১.২৬	১০.৮৮	১১.০৪	১১.০৬
প্রোটিন (গ্রাম/কেজি)	২০৭	১৮৭	১৮৩	১৮১	১৮৪
দাম (টাকা/কেজি)	৭.৮৫	৭.৫৫	৭.৭৪	৭.৭০	৭.৭৭

তাছাড়া গরুকে খওয়ানোর জন্য যে বিভিন্ন প্রকার আঁশ জাতীয় খাবার খাওয়ানোর যেতে পারে তা হলো ইউরিয়া-মোলাসেস খড় (ইউ,এম,এস) ইউরিয়া সংরক্ষিত খড় এবং কাঁচা ঘাস (যেমন, নেপিয়ার, পারা, ভূট্টা, ওট, সরগম এবং ডাল জাতীয় ঘাস, খেসারী, মাসকালাই, ইপিল-ইপিল ইত্যাদি। এই ঘাস খড়ের সাথে মিশিয়ে বা সাধারণ ঘাস ও ডাল জাতীয় ঘাস মিশিয়ে খাওয়ানোর যেতে পারে।

দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম প্রজননের গুরুত্ব, প্রয়োগ, সম্ভাবনা এবং সমস্যা

কৃত্রিম প্রজনন কি ?

প্রজননের মাধ্যমে জীবের বংশবৃদ্ধি ঘটে থাকে। বর্তমান বিশ্বে প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম উপায়ে গবাদিপশুর প্রজনন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে। প্রাণিসম্পদের গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরাসরি পুং পশু ব্যবহার না করে কৃত্রিম উপায়ে উন্নত পুং পশুর বীর্য দ্বারা প্রজনন কার্য সম্পাদন করাকেই কৃত্রিম প্রজনন বলা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে তরল বা হিমায়িত এ দুধরণের বীর্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এতে দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। দুধ ও মাংসের উৎপাদনের বৃদ্ধি ধরে রাখতে সুর্নিদিষ্ট পরিকল্পনামাফিক কৃত্রিম প্রজনন করা দরকার। ১৯৫৮ সালে এ দেশে সরকারিভাবে প্রথম গরুতে কৃত্রিম প্রজনন করা হয়।

কৃত্রিম প্রজনন

অধিক উৎপাদনশীল বাছুর উৎপাদনে কৃত্রিম প্রজননের গুরুত্বঃ

গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ছাড়া তার উৎপাদন বৃদ্ধি ও গুণগতমান পরিবর্তন করা সম্ভব না। বংশগত কারণে গাভী বা ষাঁড় যথাক্রমে নির্দিষ্ট মাত্রায় দুধ উৎপাদন করে এবং নির্দিষ্ট আকারের হয়। শুধুমাত্র খাদ্য ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে কাঙ্খিত পর্যায়ে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। বেশি উৎপাদনশীল জাতের ষাঁড়ের সিমেন/ বীর্য সংগ্রহ করে গাভীকে প্রজনন করানো হলে উন্নত গুণাবলী তার বাচ্চাতে সঞ্চারিত হয়। উন্নত জাতের ষাঁড়ের সরাসরি ব্যবহারের পরিবর্তে উন্নত জাতের ষাঁড় থেকে সিমেন সংগ্রহ করে গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন করার ক্ষেত্রে কৃত্রিম প্রজননের ব্যবহার বর্তমানে বিশ্বজুড়ে সমাদৃত হয়েছে।

অধিক উৎপাদনশীল বাছুর উৎপাদনে কৃত্রিম প্রজননের বিভিন্ন উপায়-

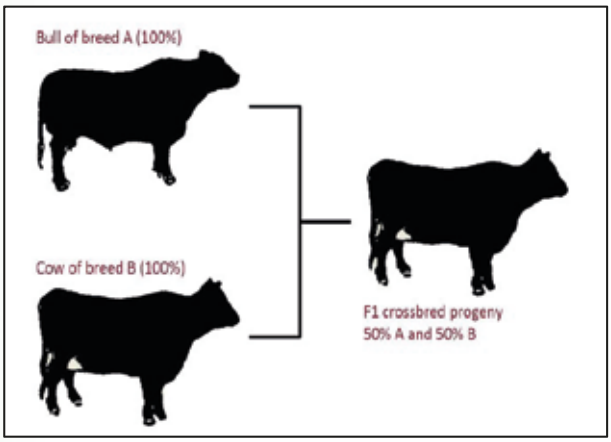

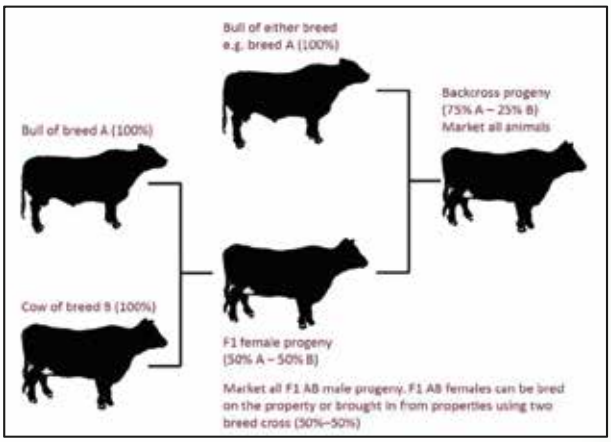

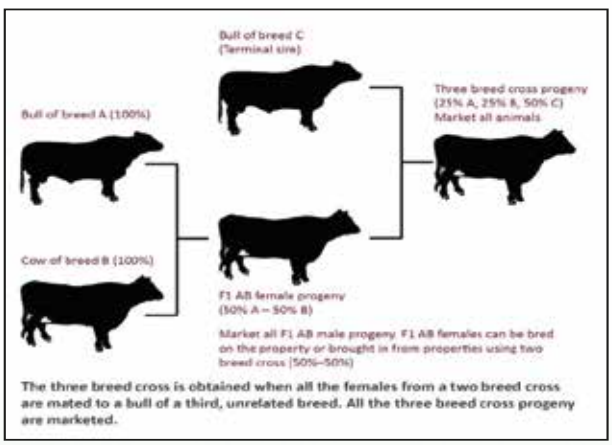

কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তি প্রয়োগে সুবিধা:

- একটি ষাঁড় থেকে একবার সংগৃহীত সিমেন দ্বারা ১০০-৪০০ গাভী প্রজনন করানো যায়। ফলে ষাঁড়ের ব্যবহার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। একটি ষাঁড়ের সারা জীবনের সংগৃহীত সিমেন দ্বারা এক লক্ষ থেকে দেড় লক্ষ গাভী প্রজনন করানো সম্ভব।
- অত্যন্ত দক্ষতার সাথে উন্নত জাতের ষাঁড় নির্বাচন করা যায়।
- উন্নত জাতের ষাঁড়ের সিমেন দ্বারা অতি দ্রুত এবং ব্যাপক ভিত্তিতে উন্নত জাতের গবাদিপশু তৈরি করা সম্ভব।
- এ পদ্ধতিতে শুক্রাণুর গুণাগুণ পরীক্ষা করা যায়।
- অনুন্নত ষাঁড় বাতিল করতে সুবিধা হয়।
- প্রজনন কাজে ব্যবহারের জন্য বাড়তি ষাঁড় পালনের প্রয়োজন হয় না।
- যেকোনো সময় যেকোনো স্থানে কৃত্রিম প্রজনন করা যায়।
- কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতিতে কম খরচে অনেক বেশি গাভীকে পাল দেওয়া যায়।
- ষাঁড়ের জন্মগত, বংশগত এবং অনেক যৌন রোগ যা সঙ্গমের মাধ্যমে গাভীর মধ্যে সংক্রমিত হতে পারে তা প্রতিরোধ করা যায়।
- গাভীর জন্মগত ত্রুটি কিংবা রোগ ব্যাধি থাকলে তাও নির্ণয় করা সম্ভব ও সহজ হয়।
- নির্বাচিত ষাঁড়ের সিমেন দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায় এবং প্রয়োজনমত যে কোন সময় ব্যবহার করা যায়। তরল সিমেন মাত্র ৩-৪ দিনের জন্য সংরক্ষণ করা গেলেও গাঢ় হিমায়িত সিমেন ৫০ বছর সংরক্ষণ করা যায়।
- প্রয়োজন হলে বিদেশ থেকে উন্নত জাতের ষাঁড়ের পরিবর্তে অল্প খরচে সিমেন আমদানী করা যায়।
- সংগমে অক্ষম উন্নত জাতের ষাঁড়ের সিমেন সংগ্রহ করে তা ব্যবহার করা যায়।
- ষাঁড় ও গাভীর দৈহিক অসামঞ্জস্যতার কারণে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে প্রজননের সম্ভাব্য দুর্ঘটনা এড়ানো যায়।
- যে সমস্ত গাভী ষাঁড়কে উপরে উঠতে দেওয়া পছন্দ করে না সে সমস্ত গাভীকে কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতিতে পাল দেওয়া যায়।
- ভিন্ন ভিন্ন জাতের গবাদিপশুর মধ্যে প্রজনন ঘটিয়ে শংকর জাত সৃষ্টি করা সহজ।
- কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে দ্রুততম সময়ে একটি পুরুষ থেকে বহু সংখ্যক সন্তান জন্মদান সম্ভব হয় বিধায় সন্তান পরীক্ষণ সম্ভব হয়। আর সন্তান পরীক্ষণের মাধ্যমে সবচেয়ে ভাল পুরুষটি অতি সহজেই বাছাই করা সম্ভব হয়।
- Sexed Semen প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে চাহিদা মত নির্দিষ্ট লিঙ্গের বাছুর পাওয়া সম্ভব হয়।

কৃত্রিম প্রজননের অসুবিধা:

- সুষ্ঠুভাবে প্রজনন করানো, সিমেন সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য দক্ষ জনশক্তির প্রয়োজন।
- গাভীর উত্তেজনা কাল সুষ্ঠুভাবে নির্ণয় করতে হয়।
- প্রজননের জন্য রক্ষিত ষাঁড়ের বিশেষ পরিচর্যার প্রয়োজন হয়।
- গর্ভবতী গাভীকে ভুলক্রমে জরায়ুর গভীরে প্রজনন করালে গর্ভপাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- কৃত্রিম প্রজননের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির মূল্য তুলনামূলকভাবে বেশী।
- কৃত্রিম প্রজনন কাজের জন্য সহায়ক গবেষণাগারের প্রয়োজন হয়।

কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তি ব্যবহারে ভাল ব্যবস্থাপনা (Good Management Practices):

Good Management Practices বা ভাল ব্যবস্থাপনার ব্যবহার ছাড়া এআই এর সফলতা অর্জন সম্ভব নহে। সঠিক এ, আই ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নজর দেয়া একান্ত প্রয়োজন।

(১) পুষ্টিকর, সুষম খাদ্য ব্যতিরেকে পশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটেনা। সেক্ষেত্রে সুষম খাদ্য সরবরাহে যত্নবান হতে হবে। তা না হলে যথাসময়ে বয়ো:প্রাপ্ত হবে না।

(২) গরম গাভী নির্ণয় বা গরমের সময় নির্ণয়ের ব্যর্থতার কারণে কৃত্রিম প্রজননে সফলতার হার খুবই কম।

(৩) দক্ষ, প্রশিক্ষিত প্রজননকর্মী দ্বারা সঠিক সময়ে গুণগতমানসম্পন্ন বীজ দ্বারা প্রজনন করাতে হবে।

(৪) সঠিক সময়ে গর্ভ পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

কৃত্রিম প্রজননে যেহেতু বিকল্প পন্থায় প্রজনন করানো হয় সেক্ষেত্রে সফলতার পুরো বিষয়টি ভাল ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভর করে। একজন খামারীকে গাভী পালনে ভাল ব্যবস্থাপনার জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এআই এর পুরো বিষয়টি বাছাইকৃত ষাঁড় হতে সিমেন সংগ্রহ করে তরলীকরণ, সংরক্ষণ, Cool chain maintain করে সরবরাহ এবং সঠিক সময়ে সিমেন প্রদান করার কোন ক্ষেত্রেই নিয়ম ভঙ্গ করলে প্রার্থিত ফল পাওয়া যাবে না। বরঞ্চ এর ব্যত্যয় ঘটালে ক্ষতির সমূহ সম্ভাবনা থাকে এমনকি গাভী চিরতরে বন্ধ্যা হয়ে যেতে পারে।

গাভীর গরম হওয়ার লক্ষণসমূহ সঠিকভাবে জানা, বীজ প্রদানের সঠিক সময় নির্ণয় করে বীজ প্রদান নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বীজ প্রদানকারীর দক্ষতার উপর সফলতার হার অধিকাংশ নির্ভর করে। বীজ প্রদানের পূর্বে বীজ পরীক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। বীজ প্রদানের আগে বা পরে বকনা/গাভীকে স্থানান্তর করা উচিৎ নয়, এতে গর্ভধারণের হার কমে যেতে পারে।

কৃত্রিম প্রজননের সফলতা ভাল ব্যবস্থাপনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। খাদ্যে অনেক খনিজ পদার্থ ও ভিটামিনের অভাবে বকনা/গাভী সঠিক সময়ে বয়ো:প্রাপ্ত হয় না বা গরমের লক্ষণ প্রকাশ করে না। হরমোনের অভাবজনিত কারণেও এরকম হতে পারে। সেক্ষেত্রে হরমোন চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। তবে হরমোনের অপব্যবহার বেশি রভাগ ক্ষেত্রে ক্ষতির কারণ হতে পারে। পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কৃত্রিম প্রজননের পূর্বশর্ত। বকনা/গাভীর পরিচ্ছন্নতা, কৃত্রিম প্রজননকারীসহ দ্রব্যাদীর পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সিমেন সংরক্ষণ ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনার উপর সর্বদা নজর রাখতে হবে।

কৃত্রিম প্রজনন ফলপ্রসূ না হওয়ার কারণ:

- **সিমেন স্ট্র:**
  ত্রুটিপূর্ণভাবে স্ট্র পরিবহণ, ত্রুটিপূর্ণ স্ট্র সংরক্ষণ, ত্রুটিপূর্ণভাবে সিমেন ক্যান থেকে স্ট্র বের করা, সিমেন ক্যানে নাইট্রোজেন পরিমাণ কমে যাওয়া, সিমেন ক্যানের ঢাকনির সাথে সংলগ্ন লাল সিলের ত্রুটি, ত্রুটিপূর্ণ থয়িং পদ্ধতি।

- **প্রজননকারী:**
  প্রজননকারীর অনভিজ্ঞতা, ত্রুটিপূর্ণ ও অদক্ষভাবে প্রজনন করানো, প্রজনন অঙ্গের ভিতর ভুল স্থানে শুক্রানু স্থাপন, গাভীর ইস্ট্রাস সম্বন্ধে ভুল ধারণা, সঠিক সময়ে প্রজনন না করা, জীবাণূ দ্বারা শুক্রাণু সংক্রমিত হওয়া, সিমেনের গুণগতমান সঠিক থাকা, প্রজননের সরঞ্জাম জীবাণূমুক্ত না থাকা প্রজননের পর গাভীকে বিশ্রাম না দেওয়া।

- **গাভী:**
  প্রজননকারীর সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়া, যৌন রোগে আক্রান্ত হওয়া, জননাঙ্গে যে কোন প্রকার প্রদাহ, নিয়মিত ঋতুচক্র, পুনঃপুনঃ গরম হওয়া ও ভুল বা ফলস্ গরম হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া, হরমোন নিঃসরণের অভাব, হরমোন নিঃসরনের ভারসাম্যহীনতা, নীরব ইস্ট্রাস, অধিক বয়স, পুষ্টির অভাব।

- **সিমেন:**
  মৃত শুক্রাণুযুক্ত সিমেন ব্যবহার, দূর্বল শুক্রাণুযুক্ত সিমেন ব্যবহার, সিমেনের মধ্যে প্রয়োজনের তুলনায় শুক্রাণুর সংখ্যা কম থাকা, অনুর্বর ষাঁড়ের সিমেন ব্যবহার, বয়স্ক অথবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ষাঁড়ের সিমেন ব্যবহার।

দুগ্ধজাত গরুতে রিপিট ব্রিডিং সমস্যা ও প্রতিকার

গাভীর প্রজনন দক্ষতা পরিমাপের জন্য নানা ধরনের নিয়ামক থাকলেও একটি গাভী বাচ্চা প্রসবের পর কত দ্রুততম সময়ে গর্ভধারণ করে - বৈশিষ্ট্যটি সর্বাপেক্ষা বেশি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বাণিজ্যিক খামারে নিয়মিত বিরতিতে গাভীর বাচ্চা প্রদান ক্ষমতা একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য। খামারের মুনাফা অনেকাংশে নিয়মিত বিরতিতে গাভীর গর্ভধারন এবং বাচ্চা প্রসব ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। একটি বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক খামারে বাচ্চা প্রসবের ৫০-৬০ দিনের মধ্যে গাভীগুলো পুনরায় গরম হয়ে থাকে এবং ১০৫ দিনের মধ্যে গর্ভধারণ করে। গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী দেখা যায় যে, গাভীর গর্ভধারণ ক্ষমতা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে:

ক) ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশগত নিয়ামকঃ গর্ভধারনের উপর শতকরা ৯৬ ভাগ প্রভাব রয়েছে।

- গাভীর পুষ্টিগত অবস্থা: দৈহিক ওজন, শক্তির ভারসাম্যতা, দেহে ভিটামিন এবং খনিজ উপাদান সমূহের প্রাপ্যতা, ইত্যাদি।
- বিপাকীয় সমস্যা: দুধজ্বর।
- গাভীর প্রজনন স্বাস্থ্যঃ পালে না আসা, পুনঃপুনঃ পালে আসা, গর্ভপাত, গর্ভফুল আটকে থাকা, জরায়ুতে সংক্রমণ, ডিম্বাশয়ের ফোস্কা এবং প্রসব জঠিলতা গুরুত্বপূর্ণ।
- গাভীর পালে আসা সনাক্তকরণ: গাভীর পালে এসেছে কিনা তা সঠিকভাবে নির্ণয়ের উপর গর্ভধারণ ক্ষমতা বহুলাংশে নির্ভরশীল। গাভী যখন অন্য গাভী/ষাঁড়কে জাম্প করতে দেয় তখন প্রজনন করালে গর্ভধারণের মাত্রা বেড়ে যায়।
- প্রজনন পদ্ধতি ও কলাকৌশল: প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পাল দেয়া হয়। কৃত্রিম প্রজননের ক্ষেত্রে সিমেনের উর্বরতা, সিমেন প্রক্রিয়াজাতকরণ, জরায়ুতে সিমেন জমাকরণের স্থান, টেকনিশিয়ানের দক্ষতা, সময়মত কৃত্রিম প্রজনন করা ইত্যাদি বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও দুপুরের তুলনায় সকালে প্রজনন করালে গর্ভধারণ হার বেড়ে যায়।
- পরিবেশের তাপমাত্রা: প্রজনন পূর্ববর্তী দিনগুলোতে অধিক উচ্চ বা নিম্ন তাপমাত্রাজনিত ধকলের প্রভাবে বকনা/গাভীগুলোর গর্ভধারণ ক্ষমতা কমে যায়।
- গাভীর বয়স: সাধারনত বয়স বাড়ার সাথে সাথে গাভীর গর্ভধারন ক্ষমতা কমতে থাকে।
- দুধ উৎপাদন: সাধারনত অধিক দুধ উৎপাদনশীল গাভীগুলোর গর্ভধারন ক্ষমতা কম হয়ে থাকে। যদিও কিছু কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে, দুধ উৎপাদনের সাথে গর্ভধারনের কোন সম্পর্ক নেই।
- গাভীর মেজাজ: প্রজননকালীন সময়ে যেসকল গাভী শান্ত থাকে তাদের গর্ভধারনের সম্ভাবনা বেশী হয়।
- বাচ্চা প্রসব করার জায়গার পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং প্রসবকালী সময়ে সাহায্যকারী ব্যক্তির স্বাস্থ্য সম্মত অবস্থা সঠিকভাবে না মানলে গর্ভফুল আটকে থাকা এবং জরায়ুতে সংক্রমণ হতে পারে।
- প্রজনন কৌশল: দীর্ঘদিন ধরে দুধদোহন অথবা অন্যকোন ব্যবস্থাপনাজনিত সুবিধার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে প্রসবের পরপর প্রজনন না করালে পরবর্তীতে গর্ভধারন করতে সমস্যা হতে পারে।

খ) বংশগত নিয়ামক- গর্ভধারণের উপর শতকরা ৪ ভাগ প্রভাব রয়েছে।

- শতকরা তিনভাগ ক্ষেত্রে গাভীর বংশগত সমস্যা
- শতকরা একভাগ ক্ষেত্রে প্রজনন ষাঁড়ের বংশগত সমস্যা

রিপিট ব্রিডিং তথা বারে বারে হিটে আসা

যে সমস্ত গাভী যথাযথ প্রক্রিয়ায় পরপর তিন বা ততোধিক বার প্রজনন করানোর পরও গর্ভধারন করে না তাদেরকে রিপিট ব্রিডার বলে। বাণিজ্যিক দুগ্ধ খামারে লাভবান হতে হলে শতকরা ৬০ ভাগ গাভীকে প্রথমবার প্রজনন করার পরে গর্ভধারণ করতে হবে এবং দ্বিতীয় বার প্রজননে সম্মিলিতভাবে ন্যূনতম পক্ষে শতকরা ৭৫ ভাগ গাভীকে গর্ভধারণ করতে হবে। কোন বাণিজ্যিক খামারের ১০০ টি গাভীর মধ্যে ২ টি গাভীর ক্ষেত্রে গর্ভধারণের জন্য পরপর ৫ বা এর অধিক বার প্রজনন করানো টা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মধ্যে পরে।

রিপিট ব্রিডিং এর সম্ভাব্য কারণসমূহ:

১. ত্রুটিপূর্ণ প্রজনন অঙ্গ
২. প্রজনন পদ্ধতিজনিত ত্রুটি
৩. গাভীর পুষ্টিগত অবস্থা
৪. গাভীর স্বাস্থ্যগত অবস্থা
৫. পরিবেশগত ও ব্যবস্থাপনাজনিত কারণ

গাভীর ত্রুটিপূর্ণ প্রজনন অঙ্গ:

- বয়সের সাথে প্রজনন তন্ত্রের সঠিক বিকাশ না হওয়া- ছোট ডিম্বাশয়, ডিম্বনালী বন্ধ থাকা, জরায়ুর ত্রুটি, ইত্যাদি

প্রজনন পদ্ধতিজনিত ত্রুটি:

- গাভীর গরম হওয়া সঠিকভাবে চিহ্নিত না করা
- সঠিক সময়ে প্রজনন না করালে - ডিম্বস্থলনের অনেক আগে বা পরে প্রজনন করালে
- জরায়ুর নির্দিষ্ট স্থানে সঠিক প্রক্রিয়ায় সিমেন জমা না করা
- অদক্ষ কর্মী দ্বারা প্রজনন করানো
- প্রজননকালীণ সময়ে স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা অনুসরণ না করা
- সিমেনের উর্বরতা কম হলে
- সিমেন প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণকালীন যথাপোযুক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা না হলে
- অধিক বয়স্ক ষাঁড়ের সিমেন ব্যবহার করা হলে

গাভীর পুষ্টিগত অবস্থা:

- গাভীর দৈহিক ওজন অধিক মাত্রায় কম বা স্থুলকার হলে
- গাভীর শরীরে দীর্ঘ দিন ধরে নির্দিষ্ট কোন ভিটামিন বা খনিজ পদার্থের ঘাটতি থাকা
- সুষম খাদ্য সরবরাহ না করা

গাভীর স্বাস্থ্যগত অবস্থা ব্যাধি:

- সংক্রমণ রোগ ব্যাধি- ট্রাইকোমোনিয়াসিস, ভিব্রিওসিস, লেপটোসপাইরোসিস, ইত্যাদি
- পরজীবির প্রাদুর্ভাব-কৃমির সংক্রমণ

পরিবেশগত ও ব্যবস্থাপনাজনিত কারণ:

- গাভীর খাদ্যে সবুজ ঘাসের সরবরাহ না রাখা
- মাত্রাতিরিক্ত গরম বা ঠান্ডা আবহাওয়া
- অনেকগুলো গাভীকে গাদাগাদি করে পালন করা
- গাভীর সাথে উত্তেজনাপূর্ণ আচরণ
- গোয়ালঘরে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস চলাচলের সু-ব্যবস্থা না থাকা
- প্রজনন পরবর্তীকালে গাভীকে মাত্রাতিরিক্ত খাদ্য প্রদান
- গাভীর বাড়ন্তকালীন সময়ে সঠিক পরিচর্যা না করা

সম্ভাব্য প্রতিকারসমূহঃ

১. গাভীতে সংক্রামক রোগ-ব্যাধি আছে কিনা পরীক্ষা করে ব্যবস্থা নেয়া।
২. প্রজনন অঙ্গসমূহের মাত্রাতিরিক্ত পর্যবেক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
৩. প্রজননের পরপর গাভীকে মাত্রাতিরিক্ত খাদ্য গ্রহন থেকে বিরত রাখা।
৪. গাভীকে পর্যাপ্ত পরিমাণে সবুজ ঘাস সরবরাহের ব্যবস্থা করা।
৫. গাভীর গরম হওয়ার লক্ষণসমূহ নিয়মিত বিরতিতে পযবেক্ষণ করা।
৬. পালে আসার প্রথম লক্ষণ প্রকাশের ১২ ঘন্টা পর প্রজনন করানো এবং পালে আসার লক্ষণসমূহ ২৪ ঘন্টার বেশি সময় ধরে বিদ্যমান থাকলে দ্বিতীয় বার প্রজনন করাতে হবে।
৭. গাভীর জরায়ুতে সংক্রমণ, দেরীতে ডিম্বস্থল অথবা অন্য কোন সমস্যা আছে কিনা তা জানার জন্য প্রাণী ডাক্তারের নিকট থেকে পরামর্শ নিতে হবে।
৮. কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে- গরম হওয়ার পর নির্দিষ্ট সময়ে, জরায়ুর নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট পরিমান সিমেন জমাকরা।
৯. দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কর্মীর মাধ্যমে গাভীকে প্রজনন করানো।
১০. গাভীর সুষম খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
১১. অধিক উর্বর ষাঁড়ে সিমেন ব্যবহার করতে হবে।

চিকিৎসাঃ

প্রজনন করার সাথে সাথে এক ডোজ গোনাডোট্রোপিন হরমোন (১০০-৫০০ মাইক্রোগ্রাম) মাংশ পেশী বা শিরায় ইনজেকশন করতে হবে।

গরুর খামারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

প্রারম্ভিকা: কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অন্যতম গুরূত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে প্রাণিসম্পদ। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১৮১.০ মিলিয়ন প্রাণীসম্পদ (গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া, হাঁস ও মুরগী) রয়েছে যা প্রতিবেশী দেশসমূহের তুলনায় অনেক বেশি। এই মূল্যবান সম্পদের সিংহভাগই পালিত হয় গ্রাম বাংলার দরিদ্র ও প্রান্তিক খামারীদের দ্বারা যারা দুধ, মাংস ও ডিম বিক্রয়ের মাধ্যমে জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করে। বাংলাদেশের খামারীরা এখন পর্যন্ত দুধ, মাংস ও ডিমকেই গবাদি পশু পালনের একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করে। কিন্তু এই দুধ, মাংস ও ডিম ছাড়াও খামারের মূল্যবান সম্পদ হল প্রাণীজ বর্জ্য যা প্রাণীকে সরবাহকৃত মোট খাদ্যের প্রায় ৫০-৫৫ ভাগ বহন করে। অর্থাৎ মোট খাদ্য ব্যয়ের প্রায় অর্ধেকই বর্জ্যের মাধ্যমে পরিবেশে নির্গত হয়। এই বর্জ্যের অপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার দরুন একদিকে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, প্রাণী ও জনস্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে এবং অন্যদিকে অধিক পুষ্টিমান সমৃদ্ধ জৈব সম্পদ ও বিপুল পরিমাণ অর্থের অপচয় হচ্ছে। অথচ, বিজ্ঞানসম্মত ও পরিকল্পিত উপায়ে প্রাণীজ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিপুল পরিমান অর্থ উপার্জন সম্ভব যা খামারীর প্রথাগত উপার্জনকে প্রায় দ্বিগুণ করতে সক্ষম। পাশাপাশি, সুষ্ঠু প্রাণীজ বর্জ্যের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনবহুল বাংলাদেশের উদীয়মান বিভিন্ন সংকট নিরসন (গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকট, মাটির জৈব উপাদান ও গুণমান হ্রাস, পরিবেশ দূষণ) সম্ভব হবে।

বর্জ্য কি: কোন উৎস হতে প্রাপ্ত অব্যবহারযোগ্য বা অবাঞ্ছিত কোন পদার্থ অথবা উপকরণ।

সুতরাং, গরুর খামার পরিচালনার প্রেক্ষিতে প্রতিদিন প্রাথমিকভাবে অব্যবহারযোগ্য যে সকল পদার্থ পাওয়া (গোবর, মূত্র, ঘর ধোয়া পানি ও অপরিপাচ্য গো-খাদ্য) যায় তাই গরুর খামারের বর্জ্য।

প্রাণীজ বর্জ্যের গুণাগুণ:

- নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস
- উন্নতমানের জৈবসার, যা মাটির জৈব উপাদান ও পানি ধারণ ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে এবং মাটির গুনাগুন রক্ষা করে
- উন্নতমানের কীটনাশক

আমাদের দেশে প্রচলিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসমূহ কি কি?

স্তুপাকারে জমাকরণ, দৈনিক খোলা জায়গায় ছড়িয়ে দেয়া, জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার, তরল পদার্থের যত্রতত্র অবমুক্তকরণ ও বায়োগ্যাস।

প্রচলিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসমূহের ফলাফল

১. মূল্যবান জৈব পদার্থের অপচয়
২. পরিবেশ তথা মাটি, পানি ও বায়ু দূষণ
৩. জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি
৪. গ্রীন হাউজ গ্যাস নি:সরণ ও বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি
৫. অর্থনৈতিক অপচয়

উন্নত উপায়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যম ও তার প্রভাব:

বায়োগ্যাস হলো বাংলাদেশে প্রচলিত উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম। তাছাড়া ও বিভিন্ন প্রকার কম্পোস্টের ব্যবহারও বহুল প্রচলিত। উন্নত ব্যবস্থাপনালব্ধ প্রত্যক্ষ ফলাফলগুলো হতে পারে- ১.বায়োগ্যাস ২. জৈব বিদ্যুৎ ৩. উন্নতমানের জৈব সার ৪.বিশুদ্ধ পানি ও ৫. জৈব বালাইনাশক। তাছাড়া পরিবেশ দূষণ লাঘব, প্রাণী ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা, বনাঞ্চল রক্ষা, নারী ক্ষমতায়ন প্রভৃতিকে উন্নত প্রাণী বর্জ্য ব্যবস্থাপনার পরোক্ষ ও গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বায়োগ্যাস কি

পচনশীল যেকোন জৈব পদার্থ যেমন: গোবর, মুরগীর বিষ্ঠা ইত্যাদি বায়ুশূন্য অবস্থায় রাখলে যে পরিচ্ছন্ন জ্বালানী গ্যাস তৈরি হয় তাই বায়োগ্যাস। ইহা প্রাকৃতিক গ্যাসের মতই জ্বলে। এতে গন্ধ নাই এবং ধোঁয়া হয় না। বায়োগ্যাস দিয়ে রান্না করা যায় আবার বৈদ্যুতিক প্রয়োজনও মিটানো যায়।

বায়োগ্যাস ব্যবহারের সুবিধাবলী

১. পরিচ্ছন্ন ও নিরাপদ জ্বালানী পাওয়া যায়
২. ধোঁয়া হয় না, ফলে পাতিল ও রান্নাঘর কালো হয় না
৩. কেরোসিন, লাকরি বা খড় কুটো লাগে না, ফলে জ্বালানী খরচ বেঁচে যায়। পাশাপাশি বনাঞ্চল রক্ষা হয়।
৪. রান্নায় কম সময় ব্যয় হয়, সুতরাং অন্যদিকে সময় দেয়া যায়
৫. লাকরির চুলায় রান্না করলে যে ধোঁয়া হয় তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক। এতে চোখ জ্বালা করে, শ্বাসনালী ও ফুসফুসের প্রদাহসহ বিভিন্ন জটিল রোগ দেখা দিতে পারে। এই প্রেক্ষিতে রান্নায় বায়োগ্যাসের ব্যবহার নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত।
৬. এতে পরিবেশ দূষণ হয় না
৭. উপজাত হিসেবে বায়োগ্যাস থেকে বায়োস্লারি পাওয়া যায় যা উন্নতমানের জৈবসার হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব।

বায়োগ্যাসের আকার ও প্রয়োজনীয় কাঁচামালের পরিমাণ

বায়োগ্যাসের সাইজ (ঘনমিটার)	গোবরের পরিমাণ (কেজি/দিন)	বিষ্ঠার পরিমাণ (কেজি/দিন)	গরুর সংখ্যা (টি)	মুরগীর সংখ্যা (টি)	কতক্ষণ জ্বলে (ঘন্টা)
১.২	৩০-৩৫	১৭	৪	২০০	২-৩
১.৬	৪০-৪৫	২৩	৫	২৫০	৩-৪
২.০	৫০-৫৫	২৮	৬	৩০০	৪-৫
২.৪	৬০-৬৫	৩৪	৭	৩৫০	৫-৬
৩.২	৮০-৮৫	৪৫	১০	৪৫০	৬-৮
৪.৮	১২০-১৩০	৭০	১৪	৭০০	১০-১২

বায়োগ্যাস ডাইজেস্টারের অংশসমূহ:

১. ইনলেট ট্যাঙ্ক: এখানে সমপরিমাণ গোবর ও পানির মিশ্রণ করা হয়।
২. ডাইজেশন চেম্বার: এখানে বায়ুশূন্য পরিবেশে অনুজীব দ্বারা গাঁজন প্রক্রিয়ায় গ্যাস উৎপন্ন হয়।
৩. আউটলেট: এই পাইপ দিয়ে গ্যাস নি:সরিত হয়।
৪. বায়োস্লারি পিট: ডাইজেশন চেম্বারে গাঁজন প্রক্রিয়ায় গ্যাস উৎপন্ন হবার পরে অর্ধ-তরল উপজাত যে পিটে জমা হয় তাই স্লারি পিট।

বায়োস্লারি: বায়োগ্যাস চেম্বার থেকে অর্ধ-তরল জাতীয় এক ধরনের জৈব উপাদান পাওয়া যায়, যাকে বায়োস্লারি হিসেবে অভিহিত করা হয়। ইহা অত্যন্ত পুষ্টিমানসমৃদ্ধ জৈবসার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে, কারণ, বায়োস্লারিতে বিদ্যমান সকল পুষ্টি উপাদান গাছের গ্রহণের জন্য প্রস্তুত অবস্থায় থাকে। ফলে, বায়োস্লারি উদ্ভুত জৈবসার ব্যবহারে দ্রুত গাছের বৃদ্ধি হয় এবং গুণমান সমৃদ্ধ ফসল পাওয়া যায়। পাশাপাশি মাটির স্বাস্থ্যও রক্ষা হয়।

বায়ো-স্লারি ব্যবহারের উপকারিতা:

- উন্নতমানের জৈবসার হিসেবে কৃষি জমিতে ব্যবহার করা যায়

- রাসায়নিক সারের সাথে ব্যবহার করলে সার ও অর্থের সাশ্রয় হয়
- ফসলের ফলন ও গুণগতমান বৃদ্ধি পায়
- বাসার ছাদে বাগানে ব্যবহারের জন্য অধিক উপযোগী

খামারের তুলনামূলক আয়ঃ

প্রথাগত খামার ব্যবস্থাপনা	উন্নত খামার ব্যবস্থাপনা
দুধ	দুধ
মাংস	মাংস
ডিম	ডিম
	বায়োগ্যাস
	বায়ো বিদ্যুৎ
	বিশুদ্ধ পানি
	জৈব সার
	জৈব বালাইনাশক

কম্পোস্ট প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি

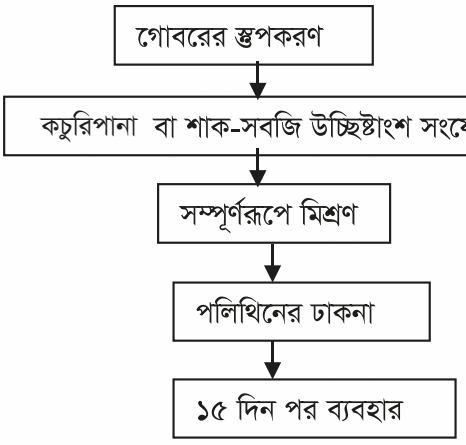

যবনিকা

পরিশেষে বলা যায় যে, পরিবেশবান্ধব ও লাভজনক উপায়ে টেকসই খামার ব্যবস্থাপনার জন্য সুষ্ঠু ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রাণীজ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম। এর মাধ্যমে খামারীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতির চাকাও সচল হবে।